শাশ্বত সত্য

১ম বর্ষ • ২০২৫
~ত্রৈমাসিক~
২য় সংখ্যা • ১৪৩২



১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শাশ্বত সত্য

জুন-জুলাই-আগস্ট

সম্পাদকীয় | অভিমত



'শাশ্বত সত্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিল এই বছরের শিবরাত্রি উপলক্ষে। দ্বিতীয় সংখ্যাও প্রকাশিত হলো।

'সত্যের সন্ধানে সনাতন' শুরু থেকেই অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সবার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিচার বিশ্লেষণই আমাদের লক্ষ্য। তাছাড়া আমরা সঠিক ইতিহাস চর্চা ও প্রচার করার চেষ্টা করি। ভুল ইতিহাস ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে আজ সনাতনীরাও নিজের বীরত্ব ভুলে গিয়েছে, যেটা সনাতনের জন্য ক্ষতিকরই।

'শাশ্বত সত্য' মানেই হচ্ছে যা চিরন্তন বা নিত্য। এই পত্রিকার (magazine) মাধ্যমে আপনারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন। 'সত্যের সন্ধানে সনাতন' সংগঠনটি শুরু থেকেই সত্যকে উপলব্ধি করানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের পত্রিকার মাধ্যমেও সেই চেষ্টাই করা হবে। গবেষণাধর্মী সনাতন ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিষয়ক প্রবন্ধ, ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য নির্ভর তথ্য, শিশুতোষ কলাম, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারযোগ্য সরল সংস্কৃত শব্দ ও বাক্য, প্রশ্নোত্তর পর্ব সহ সনাতন ধর্ম বিষয়ক বিবিধ তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি সকল সনাতনীর জন্যেই উপযোগী।

আশা করবো আমাদের এই পত্রিকাটি (magazine) আপনারা পড়ার মাধ্যমে সত্যকে মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে ধারণ করতে পারবেন। সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলেই, অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারলেই - আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো। পত্রিকাটি সবাই পড়ুন এবং নিজেদের মতামত জানান। আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকলে সেটাও জানান।

আপনাদের সমর্থনেই আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবো এবং সত্যের প্রচারে অনুপ্রেরণা পাবো। পত্রিকাটি প্রচার করে সত্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ থাকবে আপনাদের প্রতি।

সত্যমেব জয়তে....

মৃগাঙ্ক রায়

সম্পাদক, শাশ্বত সত্য

গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি

সত্যের সন্ধানে সনাতন

(আমাদের এই ম্যাগাজিনটি মাসিক সংখ্যা হিসেবেই প্রকাশ করা হয়েছিল কিন্তু এখন থেকে ত্রৈমাসিক সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে)

সম্পাদকীয় | অভিমত



সম্পাদক মণ্ডলী, উপদেষ্টা মণ্ডলী, 'সত্যের সন্ধানে সনাতন' র সকল সক্রিয় সদস্য এবং শুভাকাঙ্খীদের প্রার্থনা, সহযোগিতা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। 'শাশ্বত সত্য' সত্যের পথে এসএসএস'র এক মহৎ উদ্যোগ। সত্যের প্রচারকে আরো বেগবান করতে এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সত্যকে তর্কের দ্বারা জানা যায় না, জ্ঞানচর্চাই সত্যকে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়। পত্রিকার উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে আমি তেমন কিছুই বলবো না; আপনারা নিজেরাই পড়ুন এবং বিচার করুন - গুণগত দিক দিয়ে, সত্য উপলব্ধি করানোর দিক দিয়ে, সত্য প্রচার এবং সনাতন ধর্ম বিষয়ক জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য কতটুক কার্যকরী!

আপনারা পত্রিকাটি পড়ে এর মান উন্নয়নে বা অন্য কোনো বিষয়েও পরামর্শ দিতে পারেন। আপনাদের পরামর্শ সর্বদা গ্রহণীয়।

জয় সনাতন 🙏

সাত্যকি দেব

উপদেষ্টা, শাশ্বত সত্য

নিয়ন্ত্রক, সত্যের সন্ধানে সনাতন

সকলের প্রার্থনা, সহযোগিতা, শুভকামনা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে 'সত্যের সন্ধানে সনাতন' র উদ্যোগে আমাদের পত্রিকা 'শাশ্বত সত্য'র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

ধর্ম শব্দটির অর্থ ধারণ করা। সঠিক জীবন যাপনের পথ নির্দেশনা দেয় ধর্ম। ধর্ম অর্থ যা ধারণ করা হয় এবং অবশ্যই সত্যকে ধারণ করাই সনাতন তথা সত্য ধর্মের লক্ষণ। সনাতন ধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী হলেও কালের নিয়মে এর উত্থান পতন ঘটেছে অনেক। বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ মানুষই জগতের মোহমায়ায় আসক্ত। জীবন যাপনে নেই কোনো শৃঙ্খলা নেই কোনো অনুশাসন। তার উপর আবার বিভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে রয়েছে তর্ক বিরোধ। শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সকলের উচিত সঠিক পথ অনুসরণ করা। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা যতটুকু আত্মস্থ করেছি সেটুকুই সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম এই পত্রিকা। আপনারা পত্রিকাটি পড়ুন, জানুন এবং অবশ্যই পরামর্শ-মতামত দিন। নমস্কার 🙏

অরনী দেবনাথ

সংশোধক, শাশ্বত সত্য

ত্রৈমাসিক

শ্বাশত সত্য

সূচিপত্র

১ম বর্ষ • ২য় সংখ্যা
জুন-জুলাই-আগস্ট
২০২৫ ইং | ১৪৩২ বং

সম্পাদক মণ্ডলী

সার্বিক পরিচালনায় ও প্রকাশনায়:
‘সত্যের সন্ধানে সনাতন’



আত্মা - অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী বিশ্লেষণ

বৃহদ্রথ সান্যাল
তথ্য সহায়তায় - সাত্যকি দেব

অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে আমিই ব্রহ্মস্বরূপ (শুক্ল যজুর্বেদোক্ত বৃহঃ. উপ. ১/৪/১০)। মূলত ব্রহ্মকে আত্মা হিসেবেও বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু সবকিছু ব্রহ্ম হতেই সৃষ্ট এবং কল্পের শেষে ব্রহ্মেই লীন হয়ে যায় অতএব, অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী ব্রহ্ম তথা আত্মাই সত্য এবং বাকি সবই তত্ত্বগতভাবে মিথ্যা। কিন্তু জীব ভ্রমের কারণে আত্মাকে চিনতে পারে না তাই সে প্রকৃতপক্ষে সুখীও হতে পারে না। অষ্টাবক্র সংহিতা বা গীতায় রয়েছে -

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব॥

ভ্রমবশতই আত্মা সংসারী জীবের ন্যায় প্রতিভাত হন। কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা সংসারী নহেন, কারণ আত্মা স্বভাবতই সাক্ষী, বিভূ (যা হতে বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয়), পূর্ণ, এক, মুক্ত, চিদ্রুপ (স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ), অক্রিয়, অসঙ্গ, নিঃস্পৃহ (বিষয়াদি অভিলাষ রহিত) ও শান্তস্বরূপ।
(অষ্টাবক্র গীতা - ১/১২)
সাধারণ মানুষের মধ্যে অজ্ঞানতা বশত আমি, আমার এরূপ অহং ভাবের সৃষ্টি হয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে রয়েছে -

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥

সকল কর্ম প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সম্পাদন হয়। কিন্তু অহংকারে মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে 'আমিই কর্তা'।
(শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৩/২৭)
একারণেই তারা নিজের মধ্যে থাকা আত্মাকে চিনতে অক্ষম। অষ্টাবক্র ঋষি তাই রাজা জনককে উপদেশ দিচ্ছেন -

অহং কর্ত্যেত্যহং মানো মহাকৃষ্ণাহিদং শিতঃ।
নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব॥



হে শিষ্য ! 'আমি কর্তা' এই অহংকাররূপ মহান কৃষ্ণসর্প (কালো সাপ) কর্তৃক তুমি কবলীকৃত হইয়াছ (সাপের কবলে পরা বা সাপ দ্বারা দংশন করা হয়েছে এমন বুঝাচ্ছে)। অতএব 'আমি কর্তা নহি' - এইপ্রকার জ্ঞানরূপ অমৃত পান করিয়া অর্থাৎ অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ করো। (অষ্টাবক্র গীতা - ১/৮)
অনেকে মনে করে জীবের মধ্যে উপস্থিত আত্মা ও ব্রহ্ম একে অপরের থেকে ভিন্ন । কিন্তু এটা সঠিক উপলব্ধি নয়। শ্রুতি বচনে -

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

সকল প্রাণীর অন্তরস্থিত পরমাত্মা এক এবং সকলের নিয়ন্তা, তিনি একই রূপকে বহু রূপে বিভক্ত করেন; তাঁকে অন্তরস্থিতরূপে যাহারা দেখতে পান তাদের পরমানন্দস্বরূপ বাস্তবিক সুখ প্রাপ্তি হয়, অন্যদের সেই পরমসুখ প্রাপ্তি হয় না।" (কৃষ্ণ যজুর্বেদোক্ত কঠ. উপ. ২/২/১২)
কঠ উপনিষদের ২/২/৯-১২ এর অন্তর্ভুক্ত দুটো পদের (**একস্তথা** ও **সর্বভূতান্তরাত্মা**) বিশ্লেষণে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (চিদ্ঘানন্দ পুরী) উনার 'অদ্বৈতবাদ' নামক গ্রন্থে বলেছেন - "এস্থলে ব্রহ্মকে এক ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলায় জীব ব্রহ্মের অভেদই কথিত হইল । জীব ব্রহ্মভিন্ন হইলে জীবের অন্তরাত্মা জীবই হইবার কথা, কিন্তু তাহাকে ব্রহ্ম বলায় সে শঙ্কা আর থাকিল না।"
এবার হয়তো অনেকের মনে শঙ্কা উৎপন্ন হতে পারে যে, জীব যা ধর্ম, অধর্ম করছে তা কি তবে ব্রহ্মই করছে?
উত্তরঃ না, জীব যা করে তা আত্মার ধর্ম নয় তা মূলত মনের ধর্ম। এ নিয়ে অষ্টাবক্র মুনি, মহারাজ জনককে বলছেন -

ধর্মাধর্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো।
ন কর্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্বদা॥

হে পরিপূর্ণস্বরূপ! ধর্ম, অধর্ম, সুখ, দুঃখ — এই সবই মানসিক অর্থাৎ মনের ধর্ম। তুমি কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিহীন ও সদা মুক্ত।
(অষ্টা. গী. ১/৬)

আত্মা বিষয়ক সংশয় নিরসনে সহায়ক এই প্রবন্ধ এখানেই সমাপ্ত, বাকি বিচার বিশ্লেষণ পাঠকগণ করবেন।
বন্দে শঙ্করাচার্য 🙏

জগন্নাথ দেব ও রথযাত্রা

স্নেহা গাইন
পরিমার্জন - মৃগাঙ্ক রায়



"জগন্নাথ" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত জগৎ (বিশ্ব বা সৃষ্টি জগৎ) ও নাথ (অধিপতি) শব্দ থেকে যার অর্থ সমস্ত জগতের নাথ বা "বিশ্বের স্বামী"। পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণব দর্শনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের এক অপূর্ব রূপ। তার রূপে অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। একাধারে কঠোর, অসম্পূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট। ভক্তরা বিশ্বাস করেন - এর মধ্যে বাস করেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জগন্নাথ দেব একাকী পূজিত হন না, তাঁর সাথে পূজিত হন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রা। জগন্নাথ দেবের কৃষ্ণবর্ণ ভক্তির সর্বজনীনতা ও সীমাহীন প্রেমের প্রতীক, বলরামের শ্বেত শুভ্র বর্ণ বল ও ধার্মিকতার প্রতীক এবং সুভদ্রা মহারাণীর অঙ্গের হলুদ বর্ণ দেবী যোগমায়ার প্রতীক, সাথে ভ্রাতা-দ্বয়ের মধ্যে সংযোগশক্তির প্রতীক।

বর্তমানে জগন্নাথ দেব, বলরাম এবং সুভদ্রা মহারাণী ভারতবর্ষের ওড়িশার পুরীধামে অধিষ্ঠিত আছেন। পুরীধামে প্রতিদিন ৩৬ রকমের সেবা চলে। ৫৬ রকমের ভোগ অর্পণ করা হয় ভগবানকে। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত নানা ধরণের ভোগ, আরতি ও পূজা হয়। এখানকার মহাপ্রসাদ "অন্নব্রহ্ম" হিসেবে পূজিত হয় এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত। জাতি-বর্ণভেদ ছাড়াই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা যায় যা পুরীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রসাদকে মুক্তি দায়ক হিসেবে ধরা হয়। পুরীতে সেবা প্রতিদিন দিতে হয় বিধায় নিয়ম কিছুটা ভিন্ন। অন্য বৈষ্ণব ও স্মার্তের ন্যায় একাদশী ব্রত পালন করা হয়না। বিষ্ণুতত্ত্বের পূজারী মাত্রই একাদশী তিথি পালন করতে দেখা যায়। তবে পুরীতে একাদশীর দিনেও অন্নভোগ সেবা দেওয়া হয় এবং সমস্ত ভক্তদের সেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিশ্বাস করা হয় জগন্নাথ দেব নিজে কখনো অন্ন ছাড়া ভোগ গ্রহণ করেন না এবং তার ভক্তদের তিনি অভুক্ত দেখতে পারেন না। পুরীর ভোগ স্বয়ং মাতা অন্নপূর্ণার হাতে প্রস্তুত বলে কথিত হয়। পুরীর এই জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে আছে অসংখ্য অলৌকিক সত্য। মূল মন্দিরের চূড়ার ওপর দিয়ে কোনো বিমান তো নয়ই এমনকি কোনো পক্ষী পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে না। ভক্তদের বিশ্বাস এ হয়তো সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা। মন্দিরের শিখরে যে পতাকা ওড়ে, অলৌকিক ভাবে সেটি বাতাসের বিপরীত দিকে উড়তে দেখা যায়, যা প্রতিমুহূর্তেই জগতের অধিপতির অস্তিত্বকে প্রমাণ করে চলেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরিত্রীতে লীলার শেষে বৈকুণ্ঠ ধামে ফিরে যাওয়ার সময় মর্ত্যে থেকে গিয়েছিলো তাঁর নীল হৃদয়। আজও এই হৃদয় স্পন্দিত হয় জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের অন্তরে। এটি "ব্রহ্ম পদার্থ" নামেও পরিচিত। তাই জগন্নাথ দেবকে "নীলমাধব" ও বলা হয়ে থাকে।
প্রতি ১২ বছর পর পর জগন্নাথ দেব, বলরাম ও সুভদ্রা মহারাণীর বিগ্রহ পরিবর্তন করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় "নবকলেবর"। এটি একটি বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়- যে বছর আষাঢ় মাসে দুইবার পূর্ণিমা পড়ে সেই বছর বিশেষ রীতি মেনে অত্যন্ত গোপনীয়তা সহকারে নবকলেবর পালিত হয়।

বেদে জগন্নাথদেব ও রথ সম্পর্কে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে পাওয়া যায় -

অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্॥

অনুবাদ: ওই দূরবর্তী প্রকৃষ্টদেশে, সিন্ধু নদীর ওপাড়ে সমুদ্রের তীরে, অপৌরুষেয় যে দারুময়, পুরুষোত্তম আখ্যায়িত (হে দুহর্ণো...হন্তুমশক্য) দুঃখ বিনাশকারী দেববিগ্রহ ভাসছে, হে স্তুতিকারীগণ, তাঁহার উপাসনা করো। সেই দারুময় দেববিগ্রহের উপাসনার দ্বারা তুমি উৎকৃষ্ট বিষ্ণু লোকে উত্তীর্ণ হবে । অপর অর্থে — হে অলক্ষ্মী (এক্ষেত্রে দুহর্ণো দ্বারা দুঃখ কষ্ট বুঝাচ্ছে বা অলক্ষ্মীকে বুঝাচ্ছে)! ওই দূরবর্তী দেশে সিন্ধু নদীর ওপাড়ে সমুদ্র-তীরে ভাসমান অপৌরুষেয় ভাসমান কাষ্ঠে আরোহণ করো। ব্রহ্মণস্পতি দ্বারা প্রেরিত এই বিশেষ কাষ্ঠকে অবলম্বন করে অন্য দ্বীপে গমন করো।
(ঋগ্বেদ - শাকল শাখা - ১০/১৫৫/৩, সায়ণ ভাষ্য)
জগন্নাথকে দারুব্রহ্ম বলা হয়। এখানে মূলত আচার্য্য দুই ধরনের অর্থ করেছেন। কারণ বেদাঙ্গ নিরুক্ত অনুযায়ী পাওয়া যায় তিন প্রকারের মন্ত্র রয়েছে। তন্মধ্যে, কোন মন্ত্র একই সঙ্গে দুটো/তিনটি প্রকারের বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে (সাধারণত দুটোই দেখা যায়)। আবার বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের অংশ, বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও বেদের অন্ত তথা বেদান্তে পাওয়া যায় -



আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনশ্চ প্রগ্রহমেব চ॥

অনুবাদ: দুই আত্মার মধ্যে জীবাত্মাকেই দেহরথের আরোহী এবং শরীরকে রথ বলিয়াই জানিবে এবং বুদ্ধিকে দেহরথের চালক ও মনকে (ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের) লাগাম বলিয়া জানিবে।
(কৃষ্ণ যজুর্বেদ - কঠোপনিষদ - ১/৩/৩)
এখানে রথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

স্কন্দপুরাণ থেকে জানা যায় জগন্নাথ দেবের রথের নাম "নন্দীঘোষ", যেটি রথযাত্রায় সর্বাগ্রে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সুভদ্রা মহারাণীর রথের নাম হলো "দর্পদলন" এবং এই রথকে মধ্যবর্তী অবস্থানে রাখা হয়; সবশেষে থাকে

বলরামের রথ যার নাম "তালধ্বজ"। বর্তমানে পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ দেবের রথ নন্দীঘোষের উচ্চতা ৪৪ ফুট ২ ইঞ্চি (১৩.৪৬ মিটার), ১৬টি চাকাবিশিষ্ট। বলদেবের রথ তালধ্বজের উচ্চতা ৪৩ ফুট ৩ ইঞ্চি (১৩.০২ মিটার), ১৪টি চাকাবিশিষ্ট। সুভদ্রা মহারাণীর রথ দর্পদলনের উচ্চতা ৪২ ফুট ৩ ইঞ্চি (প্রায় ১৩ মিটার), চাকার সংখ্যা ১২ টি।

স্কন্দপুরানের বিষ্ণুখণ্ডের পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য থেকে এই রথ প্রস্তুতির কাহিনী তুলে ধরা হলো —
জৈমিনি কহিতেছেন,"নরপতি কর্তৃক নারদ জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাশাস্ত্র বিচারপূর্বক ক্রমশঃ তৎসমূদয় লিখিয়া তাঁহার সমীপে প্রদান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নও সেই সকল পত্র শ্রবণ করিতে বিবেচনা করিয়া পদ্মনিধিকে দিতে লাগিলেন, বলিলেন, "হে পদ্মনিধে! তুমি সকলই সম্পাদন কর। প্রথমত পর্ণময়ী শালা সকল প্রস্তুত কর। ব্রহ্মার সদন (ভবন) শুভ্রবর্ণ ও ব্রহ্মর্ষিগণের নিলয় (নিবাস) যেন নির্মল হয়! আর ইন্দ্রাদি সুরগণ, সিদ্ধগণ ও মর্ত্যবাসী, মুনীন্দ্রনিচয়ের নিবাসের জন্য এবং রাজগণ ও পাতাল বাসি নাগরাজগণের স্থিতির নিমিত্তে যথোপযুক্ত গৃহসকল নির্মাণ করো। হে নিধে! স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোকের লোকসমূহের উপযোগী পণ্যদ্রব্যরাশি উভয়পার্শ্বে নিক্ষেপপূর্বক মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত সরল পথ ও উভয়ভাগে শ্রেণীবদ্ধ গৃহসমূহ সম্পাদন করিতে শীঘ্র উদযোগী হও। হে নিধে! তুমি অতি সত্বরই সমুদয় দ্রব্যসজ্জার প্রস্তুত করো, বিশ্বকর্মা এবিষয়ে তোমার সাহায্য করিবেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপ আদেশ করিতেছেন এমন সময় মুনিবর তাঁহাকে কহিলেন— "রাজন! সম্ভার-সকল যেন সাবধানে পৃথকরূপে সঞ্চিত হয়। আর রথ তিনখানি যেন সুগঠিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হয় এবং দুকূল মাল্য ও রত্নাদি দ্বারা যেন ওই প্রধান রথগুলি পরিবৃত করা হয়। বাসুদেবের রথ গরুড়ধ্বজে চিহ্নিত, সুভদ্রার রথোপরি পদ্ম স্থাপন করিতে



হইবে। হে ভূপতে! আর এই নিখিল জগতের আসন, তিনিও স্বয়ং আসন-বিগ্রহ, সুতরাং স্বয়ং জগন্নাথই তাঁহার যান বিষয়ে উল্লেখিত হইলেন। যে হেতু তাঁহা ব্যতীত আর অন্য আধার বিদ্যমান নাই, তিনি সুনির্মল জ্ঞানরূপ আদর্শে সমুদয় চরাচর দর্শন করিতেছেন। তাঁহার হস্ততলে সর্বদাই নির্মল দর্পণ অবস্থান করিতেছে! ঐ দর্পণ তল-স্থিত বলিয়া উহার নাম তাল; প্রভু সর্বদা ঐ দর্পণ (তাল) চিহ্নে চিহ্নিত, অতএব বলভদ্র অনন্তদেবের রথে ঐরূপ দর্পণ (তাল) ধ্বজ-যুক্ত করিবে। অথবা লাঙ্গলী দেবের ধ্বজোত্তম লাঙ্গলই কর্তব্য। ওই ধ্বজ নির্মল রূপে সম্পাদন করিবে; ফলত তদপেক্ষা তালধ্বজ প্রশস্ত। হে ভূপতে! আর দেবদিগকে অপ্রতিষ্ঠিত রথে কদাপি উত্থাপিত করিবে না। অপ্রতিষ্ঠিত প্রাসাদে ও মণ্ডপে পুরমধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিলে নিষ্ফল হয়। এই নিমিত্ত হরিদেবের রথপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে কর্তব্য হয়। অতএব তাহার আয়োজন কর, আমিই ওই প্রতিষ্ঠাক্রিয়া সম্পাদন করিব। হে নৃপ! আমি আমার পিতার এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শীগ্রই আগমন করিলাম। ঋষিবরের এই বচন শ্রবণান্তে স্বয়ং বিশ্বকর্মা পদ্মনিধি কর্তৃক সম্পাদিত দ্রব্যজাত দ্বারা এক দিবসের মধ্যেই স্যন্দনত্রয় (তিনটি রথ) নির্মাণ করে দিলেন।"
সূত্র: স্কন্দপুরান, বিষ্ণুখন্ড পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য (পঞ্চবিংশ অধ্যায় ১-১৫ শ্লোক)
এছাড়া স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত আছে জগন্নাথ দর্শনের মাহাত্ম্য। বলা হয়েছে - নীলাচল বা পুরীতে অবস্থানকারী জগন্নাথ দেবের দর্শনে বা সেবায় জীব মুক্তি পায়। অন্য কোনো উপায়ে মুক্তি সম্ভব নয়।

জয় জগন্নাথ🙏🌸



হারিয়ে যাওয়া নদী সরস্বতী

উচ্ছ্বাস তালুকদার

সরস্বতী হচ্ছে বিখ্যাত একটি নদী, যার উল্লেখ বৈদিক পাঠ থেকে শুরু করে মহাভারতাদি ইতিহাস গ্রন্থ ও পুরাণে পাওয়া যায়। যদিও বর্তমানে নদীখাতটি হারিয়ে গিয়েছে। তবে সরস্বতী নদীর অবস্থান নির্ণয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। দুটি বহুল আলোচিত মতবাদ রয়েছে। একটি হচ্ছে হেলমান্দ ও অন্যটি ঘগ্গর-হাকরা।

হেলমান্দ নদী আফগানিস্তানের দীর্ঘতম নদী, এটি হিন্দুকুশ পর্বতমালার সাংলাখ রেঞ্জে উৎপন্ন হয়েছে। নদীটি আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্ত দিয়ে বয়ে গেছে এবং অবশেষে হামুন হ্রদে মিলিত হয়েছে। হেলমান্দ নদীর জল এই হ্রদে পতিত হওয়ার কারণে এটি "এন্ডোরিয়িক" বা অভ্যন্তরীণ নদী হিসেবে পরিচিত। এই নদীর জল বর্তমানে অনেক কম, প্রায় শুকনো জলাভূমির ন্যায় (এখনো মৃত নয় তবে হুমকির মুখে)। ঘগ্গর-হাকরা নদী ভারতের হিমাচল প্রদেশের শিবালিক পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এটি হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাকিস্তানের চোলিস্তানে প্রবেশ করে, যেখানে এটি হাকরা নামে পরিচিত। ভারতে যে নদীটি রয়েছে সেটির নাম ঘগ্গর, এটি একটি শুকনো নদীখাত (মৃত নদী) এবং মাঝে মাঝে এর গতিপথ হারিয়ে গিয়েছে; তবে বর্ষাকালে নদীটিতে জল থাকে।

সরস্বতী হিসেবে দুটো নদীর পক্ষে ঐতিহাসিকগণ ও গবেষকগণ যেসব গ্রন্থকে ভিত্তি করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সেগুলোর মধ্যে সাধারণ গ্রন্থ হচ্ছে বেদ (ঋগ্বেদ প্রধান), মহাভারত, পুরণাদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। তবে হেলমান্দকে যারা সরস্বতী হিসেবে প্রমাণ করেছেন তারা জরাথ্রুস্ত্রবাদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তাকেও পূর্বের গ্রন্থগুলোর সাথে ভিত্তি হিসেবে মানেন। যদিও আবেস্তায় সরাসরিভাবে সরস্বতী নামের উল্লেখ নেই। অন্যদিকে ঋগ্বেদ, মহাভারতাদি গ্রন্থে সরস্বতী নামের সরাসরি উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে সরস্বতীর দুটো রূপ পাওয়া যায়। ষড় বেদাঙ্গের অন্যতম নিরুক্ত (২/২৩) অনুযায়ী সরস্বতীর দুটো রূপের কথা আছে (এটি আচার্য্য সায়ণ কৃত ঋগ্বেদ ভাষ্যেও পাওয়া যায়)। দুটো রূপের মধ্যে একটি হচ্ছে বিগ্রহ বা দেবতা স্বরূপা আর অন্যটি হচ্ছে নদী স্বরূপা। তবে এই লেখার আলোচ্য বিষয় সরস্বতী নদী। ঋগ্বেদ (শাকল) ৭/৯৫/২ এ আছে -



ছবি - ১

একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।
রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায়।।

অনুবাদ: সরস্বতী, অন্যান্য নদীর মধ্যে একমাত্র পবিত্র নদী এবং পাহাড় থেকে সমুদ্রে প্রবাহিত, রাজা নহুষের প্রার্থনা বুঝতে পেরেছিলেন এবং জীবদের প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে, নহুষের রাজাকে দুধ পান করিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাকে হাজার বছরের যজ্ঞের জন্য পর্যাপ্ত ঘি দিয়েছিলেন।

এখানে পাহাড় থেকে সমুদ্রে প্রবাহিত স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঠিক কিন্তু কোন অঞ্চলের পাহাড় সেটা কিন্তু বলা নেই। হেলমান্দও পাহাড় থেকে উৎপত্তি (হিন্দুকুশ পর্বতমালা) আবার ঘগ্গরও পাহাড় থেকেই উৎপত্তি (হিমালয়ের পাদদেশে থাকা শিবালিক পাহাড়)। তাহলে পাহাড় দিয়ে নির্ণয় হলো না মূলত কোনটিকে প্রাচীন সরস্বতী বলা হতো! তবে হেলমান্দ সমুদ্রে পতিত হয় নি, হ্রদে পতিত হয়েছে। বর্তমান ঘগ্গর-হাকরা সরাসরি সমুদ্রে পতিত হয় না, সিন্ধু নদে পতিত হয় এবং সিন্ধুর জল আরব সাগরে মিলিত হয়। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষই বলেন যে, গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে এবং পূর্বে সরাসরিই সমুদ্রে পতিত হতো। অতএব, বিষয়টির সমাধান এটা দিয়ে পুরোপুরি হলো না। ঋগ্বেদ (শাকল) ১০/৭৫/৪ এ রয়েছে -



ছবি - ২

অভি ত্বা সিন্ধো শিশুমিন্ন মাতরো
বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনবঃ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ
যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি।।

অনুবাদ: হে সিন্ধু! যেমন মা তার সন্তানদের কাছে গমন করেন, সদ্য প্রসূতা দুগ্ধবতী গাভী যেমন বাছুরের কাছে ছুটে যান, তেমনি অন্য নদীগুলি কলধ্বনি করতে করতে আপনার দিকে ধাবিত হয়। যেমন কোনো যোদ্ধা রাজা তার সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হয়, তেমনি আপনিও আপনার সঙ্গে প্রবাহমান সকল নদীর অগ্রভাগে থেকে আপনার উভয় তীরের জল নিয়ে এগিয়ে যান।

তাহলে অন্য নদীর জল যে সিন্ধুর দিকে ধাবিত হতে পারে সেটার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। স্কন্দ পুরাণ প্রভাস খণ্ডের প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য অংশে রয়েছে -

"...... গঙ্গাদেবী এই কথা বলিলে দেবী সরস্বতী তাঁহার পুনর্দর্শন লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,- অয়ি ভদ্রে! এখন তুমি যাও, দেখ, যেন মনে রেখো। এই রূপে দেবী (সরস্বতী) সাবিত্রী যমুনা, গায়ত্রী ও সাবিত্রী প্রভৃতি সহচরীগণকে বিদায় দিয়া নদী হইয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তত্রত্য প্লক্ষ হইতে নির্গত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন।......" এখানে কোন অঞ্চলের পর্বত এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল। এছাড়াও ঋগ্বেদ (শাকল) ১০/৭৫/৫ এ রয়েছে -

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া।।

অনুবাদ: প্রধানত গঙ্গা ইত্যাদি সাতটি প্রধান নদী এবং বিতস্তা ইত্যাদি তাদের তিনটি সহায়ক নদীর স্তুতি করা হচ্ছে - হে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতুদ্রি (শতলুজ), পরুষ্ণী (রবি), অসিক্নী (চেনাব) এবং সঙ্গে মরুদ্বৃধা (মরুবর্ধবন) তথা বিতস্তা (ঝিলম), সুষোমা (সোহান) ও আর্জীকীয়া (ব্যাস) - তোমরা সকলে আমাদের এই স্তোত্রের পান করো ও শ্রবণ করো। (বর্তমানে শতুদ্রি শতুদ্রু এবং ব্যাস নদী বিপাশা নামে পরিচিত)।

এই মন্ত্র দ্বারা অনেকে বলেন যে যমুনা ও শতুদ্রু এর মাঝখান দিয়ে সরস্বতী প্রবাহিত হয়েছিল আবার অনেকে বলেন এগুলো সবই পাশাপাশি আলাদা গতিপথে প্রবাহিত হয়েছিল। আফগানিস্তানের হেলমান্দ নদী কোনোভাবেই যমুনা বা শতদ্রু এর মাঝে বা পাশাপাশি প্রবাহিত হতে পারে না। তাছাড়া হেলমান্দ হিমালয় অঞ্চল থেকেও

উৎপত্তি হয় নি এবং সমুদ্রেও গিয়ে মেশে নি। অতএব এসবের ভিত্তিতে এবং মানচিত্রে পাওয়া শুকিয়ে যাওয়া ঘগ্গর হাকরার গতিপথ দেখে এটাই প্রমাণিত হয় যে - ঘগ্গর বা ঘগ্গর-হাকরাই হারিয়ে যাওয়া সরস্বতী নদী। সরস্বতী নদীর ধ্বংসের বিষয়ও ঐতিহাসিকগণ বেদ, মহাভারতাদি গ্রন্থ থেকে দেখান। ঋগ্বেদ (শাকল) ৬/৬১/২ অনুযায়ী -

ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখি ইবারুজৎ সানু গিরীণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ।

পারাবেতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ।।

অনুবাদ: সেই সরস্বতী নদী প্রচণ্ড ও দুর্দান্ত তরঙ্গসমূহ নিয়ে পর্বতের খাড়াই ঢাল বা শৃঙ্গসমূহ ভেঙে ফেলে, যেন পদ্মমূল (কমলের তন্তু) খননকারী এক খননকারীর মতো। সেই দুই তীর ধ্বংসকারী সরস্বতী নদীকে অনুকূলে রাখার জন্য আমরা স্তব ও যজ্ঞের মাধ্যমে তাঁর পরিচর্যা করি—অর্থাৎ পূজা ও বন্দনা করি, যাতে তিনি আমাদের রক্ষা করেন।

এখানে নদী রক্ষার দিকে নজর দেওয়াকেই সম্ভবত পরিচর্যা বলা হয়েছে। তাছাড়া মহাভারত শল্য পর্বের গদাযুদ্ধ উপপর্বে রয়েছে -



ছবি - ৩

"বৈশম্পায়ন বলিলেন-রাজা! তাহার পর-যেখানে শূদ্রগণ এবং বিশেষতঃ গোপালগণের উপর বিদ্বেষবশতঃ সরস্বতীনদী অদৃশ্য হইয়াছে, বলরাম সেই বিনশনতীর্থে গমন করিলেন।"

অর্থাৎ মহাভারতের যুগে বা তার কিছু পূর্বেই সরস্বতী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশাল নদীর পরিচর্যার অভাবকেই দেবী সরস্বতীর বিদ্বেষ বলা হচ্ছে। যারা হেলমান্দ নদীকে সরস্বতী হিসেবে তুলে ধরেন তারা বলে থাকেন, ঘগ্গর' বেদ লেখার পূর্বেই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেদকে তো শ্রুতি বলা হয়, শ্রুতি অর্থ যা শুনে শুনে মনে রাখা হয়। প্রথমত, বেদ শ্রুতি বিধায় লিখিত কবে হয়েছে সেটা দ্বারা ঘগ্গর বিষয়ক তথ্য খণ্ডন হয় না, অন্যথা বেদের শ্রুতি নাম ব্যর্থ। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেদ, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি ওই ওই সময়ের

সাহিত্যগ্রন্থ এবং একইসাথে ইতিহাসের বর্ণনা আছে; ইতিহাস তো ভবিষ্যত বলে না, যেটা অতীত হয়েছে সেটাই ইতিহাসের পাতায় লিখিত হয়।
বাকি বিচার বিশ্লেষণ পাঠকগণ করবেন!



ছবি - ৪

তথ্যসূত্র:
১) The Sarasvati and the Lost River of the Indian - C.F. Oldham
২) A Survey of Ancient Sites Along the "Lost" Sarasvati River - Sir Aurel Stein
৩) Orginal Sanskrit Texts - J. Muir
৪) Sacred Books of East, part 32
৫) Rig-Veda Sanhita - H.H. Wilson (english)
৬) Ṛgveda Samhita - Dr. Bhishmadatt Sharma (hindi)
৭) সিন্ধু সভ্যতার কথা ও কাহিনী - রজত পাল
৮) স্কন্দ পুরাণ - নবভারত পাবলিকেশন্স
৯) মহাভারত - হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ অনূদিত
১০) উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য অন্তর্জাল
১১) সকল ছবি অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত:
ছবি ১ - ঘগ্গর- হাকরা ও অন্যান্য নদীর গতিপথ (এখানে স্পষ্টত শুরুতে যমুনা ঘগ্গর কিছুটা অঞ্চলে পাশাপাশি ছিল, এক্ষেত্রে অনেকে বলেন গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায়)
ছবি ২ - বর্তমানে ভারতের প্রধান নদীর গতিপথ সম্বলিত মানচিত্র
ছবি ৩ - হরিয়ানায় ঘগ্গর নদী
ছবি ৪ - রাজস্থানের নিকট অনুপগড়ে ঘগ্গর (সেপ্টেম্বর মাসে)

বিঃ দ্রঃ বেদের ক্ষেত্রে প্রচলিত বেদ ও ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ইতিহাসবিদগণও সেগুলোই অনুসরণ করেছেন।





মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম-বৃত্তান্ত

অর্ক বিশ্বাস
গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি
সত্যের সন্ধানে সনাতন

ব্যাস পূর্ণিমা, যা গুরু পূর্ণিমা নামেও পরিচিত, হলো সেই পবিত্র তিথি যেদিন আমরা স্মরণ করি মহর্ষি বেদব্যাসকে— যিনি মানবজাতিকে জ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের অপূর্ব আলো প্রদান করেছেন। তাঁর অসীম অবদানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব ও সাহিত্যের ভিত্তি গঠিত হয়েছে। তিনি শুধু "মহাভারত" এর রচয়িতা নন, বরং চারটি বেদ সংকলন, ১৮টি পুরাণ এবং উপপুরাণের সূত্রধার বলেও পরিচিত। বেদব্যাসের পিতা ছিলেন পরাশর মুনি এবং মাতা ছিলেন সত্যবতী। তাঁর জন্মতিথিকে কেন্দ্র করেই আজও ভারতবর্ষজুড়ে গুরুদের সম্মান ও স্মরণে পালন করা হয় গুরু পূর্ণিমা।

এই দিনে, তাঁর জীবন ও জন্মকাহিনী স্মরণ করা মানেই শাশ্বত জ্ঞান ও ধর্মপথে শ্রদ্ধার সঙ্গে ফিরে দেখা। মহাভারতের আদিপর্বে ঋষি বৈশম্পায়ন মহারাজা জনমেজয়ের নিকট বেদব্যাসের জন্মকাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন। নিম্নে সেখান হতেই বেদব্যাসের জন্মকাহিনী তুলে ধরছি:-

সেই কন্যাটির রূপ, উৎসাহ ও সমস্ত গুণ ছিল এবং বাস্তবিক নাম ছিল সত্যবতী; আর মৎস্যঘাতীদিগের আশ্রয়ে থাকায় অনেকে তাহাকে কিছু কাল 'মৎস্যগন্ধা' বলিয়াও ডাকিত; সে পরমা সুন্দরী ছিল; তাই সিদ্ধ-মুনিগণেরও

লোভ জন্মাইত। কোন সময় সেই কন্যাটি তাহার পিতার আনুকূল্য করিবার জন্য যমুনার জলে পিতারই নৌকা বাহিতেছিল; এই সময়ে তীর্থ-যাত্রায় বহির্গত পরাশর মুনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই তিনি কামার্ত হইয়া পড়িলেন; কেন না, তখন সে সুন্দর হাসিতেছিল, তাহার স্বর্গীয় রূপ প্রকাশ পাইতেছিল এবং ঊরু দুইটি কদলীস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

তখন পরাশর তাহার (সত্যবতীর) জন্ম স্মরণ করিয়া, তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন— "সুন্দরী! যে (যিনি) নৌকা বাহিয়া থাকে, সে নাবিক কোথায় গিয়াছে, বল"। মৎস্যগন্ধা বলিলেন— "ব্রাহ্মণ! ধীবররাজের কোনো পুত্রসন্তান নাই; আমিই তাঁহার একমাত্র কন্যা; তাই সহস্র লোক আরোহণ করিলে তাঁহার সন্তোষের জন্য আমিই এই নৌকা বাহিয়া থাকি।" পরাশর বলিলেন— "কল্যাণী! বসুনন্দিনী! তুমি ভালো কাজ করিতেছো। যাহা হউক, তুমি বিলম্ব করিতেছো কেন, নৌকা বাহিতে থাক। ভদ্রে! আমার অনুগ্রহে এই নদী সহস্র ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইবে এবং আমিই আজ শেষ আরোহী হইব; সুতরাং সত্বর আমাকে পর পারে নিয়ে যাও।"

বৈশম্পায়ন বলিলেন— 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া মৎস্যগন্ধা নৌকা বাহিতে লাগিলেন; এদিকে পরাশর তাঁহার প্রতি সতৃঞ্চ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন। ইহা দেখিয়া তখন মৎস্যগন্ধা এই কথা বলিলেন—"আমি ধীবররাজের কন্যা; লোকে আমাকে মৎস্যগন্ধা বলিয়া থাকে; আমার বাস্তবিক পিতা-মাতা নাই বলিয়া আমি শোকসন্তপ্ত; এ অবস্থায় আপনি আমার জন্মের বিষয় জানিলেন কী করিয়া, বলুন।"

পরাশর বলিলেন— "আমি দেখিবামাত্র দিব্যজ্ঞানে তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। বসুনন্দিনী! তোমার প্রণয় লাভ করিবার জন্য আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শোন। বর্হিষদ নামে বিখ্যাত সোমপায়ী কতকগুলি পিতৃলোক আছেন; তুমি তাঁহাদের মানসী কন্যা ছিলে; তখন তোমার নাম ছিল 'অচ্ছোদা'। তোমা হইতেই সেই অলৌকিক অচ্ছোদ সরোবর জন্মিয়াছিল। তুমি কোন সময়েই সেই পিতৃগণকে দেখ নাই। তুমি পিতৃগণেরই মন হইতে জন্মিয়াছিলে, অথচ তাঁহাদিগকে আপন পিতা বলিয়া জানিতে না। তাই, তুমি সেই আপন পিতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোককে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে; সে লোকটির নাম ছিল— 'বসু', তিনি স্বর্গীয় মনুর পুত্র ছিলেন এবং তৎকালে তিনি আকাশে বিমানের ভিতর অদ্রিকানামক অপ্সরার সহিত বাস করিতেছিলেন। তুমি নিজের ইচ্ছানুসারেই রূপ ধারণ করিতে পারিতে; কিন্তু অন্য লোককে পিতা বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই অপরাধেই যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিলে।

তুমি পড়িবার সময়ে নিকটে তিনখানা বিমান দেখিয়াছিলে এবং তাহার ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি সেই আপন পিতৃগণকেও দেখিয়াছিলে। অঙ্গুলি যেন সেই পিতৃপুরুষগণকে অপর অঙ্গের ভিতরে রাখিয়া দিয়াছিল এবং তাঁহারা এত ক্ষুদ্র ছিলেন যে, তাঁহাদিগকে দেখা যাইতেছিল না; এদিকে তুমি অধোমুখ হইয়া পড়িতে থাকিয়া 'হা পিতঃ!' বলিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিয়াছিলে। তখন তাঁহারা তোমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'ভয় নাই'; তাহাতেই তুমি আকাশে বহিয়া গিয়াছিলে। তাহার পর তুমি কাতর বাক্যে আপন পিতৃপুরুষগণকে প্রসন্ন করিয়াছিলে।

তখন পিতৃগণ তোমাকে বলিয়াছিলেন যে, "শুভ্রহাসিনী! তুমি নিজের দোষে অণিমাদি-ঐশ্বর্য্যশূন্য হইয়া পড়িতেছ। এই জগতে দেবতারা যে শরীরদ্বারা ধর্ম বা অধর্ম করেন, সেই শরীর দ্বারাই তাঁহারা ফল ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যেরা অন্য শরীর দ্বারা ধর্মাধর্মের ফল ভোগ করে—ইহাই বিধাতার নিয়ম। আর, দেবতার কর্মফল সদ্যই হয় এবং মনুষ্যের কর্মফল জন্মান্তরে হইয়া থাকে। অতএব পুত্রি! তুমি দেবতা বলিয়া, আপন কর্মফলে সদ্যই পড়িয়া যাইতেছ, মনুষ্য হইলে জন্মান্তরে ফলভোগ করিতে। তোমার দোষ এই যে, তুমি পিতৃপুরুষ চিনিতে না পারিয়া আপনাকে আপনি বসুর কন্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। তুমি উপরিচর রাজার ঔরসে মৎসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। এদিকে সে অদ্রিকা (বসুর সঙ্গে বিহাররত অপ্সরা) প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমস্থানে মৎস্যরূপে জন্মিয়াছে। তুমি পরাশরের ঔরসে একটি পুত্র প্রসব করিবে; যে পুত্রটি পরে ব্রহ্মর্ষি হইয়া এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিবে। আর, তুমি শান্তনুরাজার ঔরসে মহাবীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুইটি পুত্রকেও প্রসব করিবে। তুই এই তিনটি উৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করিয়া পুনরায় আপন পিতৃলোকে চলিয়া যাইবে। আপন পিতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পিতা গ্রহণ

করাতেই তুমি কুৎসিত জন্মগ্রহণ করিবে। তুমি উপবিচর রাজার কন্যারূপে অদ্রিকার গর্ভে জন্মিবে; সে জন্মটা অদ্য হইতে অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে মৎস্যযোনিতে হইবে।"

সেই পূর্বকালে পিতৃলোকেরা তোমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন; তাই তুমি এখন সত্যবতী হইয়া জন্মিয়াছ। অদ্রিকা অপ্সরাও ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে মৎসী হইয়া, তোমাকে প্রসব করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। সেই তুমি উপবিচর রাজার ঔরসে সেই মৎসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব বসুকন্যে! তোমার মঙ্গল হউক; আমি তোমার নিকট একটি বংশরক্ষক পুত্র প্রার্থনা করি; সুতরাং কল্যাণী! তুমি আমার সহিত সঙ্গম কর।" পরাশর এই কথা বলিলেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন— পূর্বজন্ম স্মরণ হওয়ায় বিস্ময়ে মৎস্যগন্ধার সর্ব অঙ্গে রোমাঞ্চ জন্মিল; তখন সে বলিল— "ভগবন্! অপর পারে ঋষিরা রহিয়াছেন দেখুন; সুতরাং ইঁহারা দেখিতে থাকিলে আমাদের সঙ্গম হইবে কী প্রকারে?" মৎস্যগন্ধা এইরূপ বলিলে, তপঃপ্রভাবশালী পরাশর নীহার (কুয়াশা) সৃষ্টি করিলেন; তাহাতে সে স্থানটা সমস্তই যেন অন্ধকারময় হইয়া গেল। মহর্ষি নীহার সৃষ্টি করিয়াছেন দেখিয়া মৎস্যগন্ধা বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। সত্যবতী বলিল— "ভগবন্! আমি কুমারী, বিশেষতঃ সর্বদাই পিতার অধীন হইয়া চলিয়া থাকি; আর আপনার সংসর্গ করিলে, আমার কন্যাত্ব দূষিত হইবে। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! হে মহর্ষি! হে ধীমান! আমার কুমারী-অবস্থা দূষিত হইলে, আমি কী করিয়া বাড়ি যাইব; বাঁচিতেও তো পারিব না। মহর্ষি! এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পরে যাহা কর্তব্য হয় করুন।" মৎস্যগন্ধা এইরূপ বলিলে, পরাশর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন— "তুমি আমার প্রিয় কার্য করিয়া কন্যাই থাকিবে। হে অনুরাগিণী! হে ভয়শীলে! তুমি যে বর ইচ্ছা কর, তাহাই গ্রহণ কর। হে শুভ্রহাসিনী! আমার অনুগ্রহ পূর্বে কখনও নিষ্ফল হয় নাই।" পরাশর এইরূপ বলিলে, মৎস্যগন্ধা আপন গাত্রের উত্তম গন্ধ বর চাহিল।

প্রভাবশালী মহর্ষি পরাশর মৎস্যগন্ধার অভিলষিত বর তাহাকে দিলেন। তদনন্তর, স্ত্রীজাতির স্বভাব ও সৌন্দর্য্যাদি-গুণশালিনী সত্যবতী, অদ্ভুতকর্মা পরাশরের সহিত সংসর্গ করিল। সেই পরাশরের বরে উহার 'গন্ধবতী' এই নামটি



জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। লোক সকল এক যোজনের পথ হইতে সত্যবতীর শরীরের সৌরভ আঘ্রাণ করিতে পারিত; সেই জন্য তাহার 'যোজনগন্ধা' এইরূপ আর একটি নাম প্রসিদ্ধ হইল।

এইভাবে সত্যবতী উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়া, পরাশরের সংসর্গে সদ্যই গর্ভ ধারণ করিলেন এবং প্রসব করিলেন। পরাশরের পুত্র যমুনা দ্বীপেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন এবং মাতার অনুমতি লইয়া তপস্যাতেই মনোনিবেশ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন— "মা! কার্য উপস্থিত হইলে, আপনি আমাকে স্মরণ করিবা-মাত্রই আমি আপনাকে দর্শন দান করিব।" এইভাবে পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে দ্বৈপায়ন জন্মিয়াছিলেন। সেই বালকটিকে দ্বীপে স্থাপন করা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল—'দ্বৈপায়ন'। তিনি কালক্রমে মহাজ্ঞানী হইয়া, প্রত্যেক যুগে ধর্মের এক এক পাদ হ্রাস পাইতেছে এবং লোকের আয়ু ও শক্তি কমিয়া যাইতেছে ইত্যাদি যুগের অবস্থা দেখিয়া, বেদ ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন, তাহাতেই তাঁহার নাম হয় 'ব্যাস'। প্রভাবশালী বরদাতা মুনিশ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়ন সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল আর নিজ পুত্র শুক এবং বৈশম্পায়নকে সাম, ঋক, যজু ও অথর্ব—এই চারিটি বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত অধ্যয়ন করান। পরে তাঁহারাই মহাভারতের মূল সংহিতাগুলি পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ করেন।

মহর্ষি বেদব্যাস শুধু একজন ঋষি নন—তিনি ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব, সাহিত্য ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক মহাকল্পবৃক্ষ। তাঁর জন্ম, কর্ম ও সাধনা কেবল একটি ঐতিহাসিক কাহিনী নয়, বরং মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের মূর্ত প্রতীক। তাঁর দ্বারা সংকলিত বেদ, রচিত মহাভারত এবং প্রচারিত পুরাণসমূহ যুগে যুগে আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থেকেছে। ব্যাস পূর্ণিমা শুধু তাঁর জন্মোৎসব নয়, বরং প্রতিটি সত্যসন্ধানী, জ্ঞানপিপাসু ও আধ্যাত্মিক অন্বেষকের জন্য এক শ্রদ্ধার দিন। এই দিনে তাঁকে স্মরণ করা মানেই—জীবনে জ্ঞান, ধর্ম এবং সাধনার পথকে পূর্ণ শ্রদ্ধায় বরণ করে নেওয়া।

তথ্যসূত্র: মহাভারত-আদিপর্ব-১৫৮/৮২-১২৯ (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ)



সনাতন ধর্ম ও একেশ্বরবাদ

আবির কুমার দাশ (গৌড়ীয়)

অনন্তম ব্রহ্মা!

ব্রহ্ম এক। ব্রহ্মই সেই পরম সত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন,কিন্তু ব্রহ্ম দুই নহে। কারণ ইহার তাৎপর্য ইহা, সত্য কখনো দুই হইতে পারেনা, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম এক। কিন্তু ব্রহ্মের বহু রূপ, স্বরূপ রয়েছে। তাই,একই বহু, সেই বহুই এক। ইহা প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামীপাদজীউ বলেন, ব্রহ্মসংহিতার "রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন"- ইত্যাদি শ্লোকের টীকা হইতে জানা যায়-এক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই নানাবিধ অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়- ভগবৎ-স্বরূপগণ দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহারা এক পরমব্রহ্ম। এক পরব্রহ্মই বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ হইয়া থাকেন। সুতরাং পরব্রহ্ম একজনই, বহু নন। পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহও তাহাই বলে।

আবার, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলে-
"একই বিগ্রহ, কিন্তু আকারবিভেদ" ॥১।২।২০
"অনন্ত রূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ" ॥১।২/৮৩।।
"একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ" ॥২।৯/১৪১৪
"একই বিগ্রহ তাঁর, অনন্ত স্বরূপ" ॥২।২০/১৩৭।

ব্রহ্ম বহু হইতে পারেন, ভগবান গীতায় ৪/৬ এ ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" ইহার উত্তরে শ্রীবলদেববিদ্যাভূষনপাদজীউ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'স্বীয় ইচ্ছাশক্তির আশ্রয়রূপ।'
-ইহার ব্যাখ্যানে ব্রহ্মের অনন্তরূপের প্রকাশের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবার সার্মথ্য হয়। গীতায় আরেকদিকেও ইহার বর্ণনা আছে। তাহা ৪/৭ শ্লোকে তদাত্মানং সৃজামেহ্যম-তদ্ পূর্বক নিজেকে সৃষ্টি করি। ইহা দিব্য জন্ম। যাহা

লৌকিক জন্ম নয়(শ্লোক নং-০৫)যাহা দিব্য তাহার ব্যাখ্যান-
"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" ৪/০৯
ইহার ব্যাখ্যানে,কৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম দিব্যময়(চিন্ময়ময়)যুক্ত কাজ আর যা ব্যাক্তিরা তত্ত্বতঃ ভাবে জানিয়া থাকেন। তাই ইহা তত্ত্বতঃ। আর ইহায় ব্রহ্মং অনন্তম। সংজ্ঞা - যে ব্রহ্ম অনন্ত রূপে আর্ভিভূত হতে পারেন। যার অসম্ভব কিছুই নয়!
ইহার আরো সুন্দর মীমাংসা করা যাইতে পারে,তা হলো,মহামানবব্রত ব্রহ্মচারীজিউর "বেদ-বিচিন্তন" গ্রন্থের বেদের একেশ্বরবাদ অনুচ্ছেদের যে বিষয়-
"বেদশাস্ত্রে ভাব, ভাষা ও তাৎপর্য একটি রহস্যময়তার আবরণে ঘেরা। গুরু-শিষ্য সংবাদ, ঋষিদের আলাপন, তর্কযুদ্ধ ইত্যাদিতে বহু প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়া এই রহস্যময়তার আবরণ কিঞ্চিৎমাত্র উন্মোচিত হয়।
সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া শাস্ত্র-রহস্য উন্মোচনের আর কোন পথ থাকে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণে শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদটি পুনঃ বিস্তার করিয়া স্মরণ করিতেছি।"

বিদগ্ধ শাকল্য প্রশ্ন করিতেছেন পরম প্রাজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যকে, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, বেদে দেবতা কত জন?" যাজ্ঞবল্ক্যঃ উত্তর করিলেন "নিবিদে আছে দেবতা ৩০৩ ও ৩০০৩ জন" (ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি)।
শাকল্যঃ হ্যাঁ, ঠিক কত জন? (কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি?)
যাজ্ঞবল্ক্যঃ উত্তর করিলেন, তেত্রিশ জন। (ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইত্যোমিতি)
শাকল্যঃ হাঁ, ঠিক কত জন? (কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যতি?)
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ছয় জন (ষড়িত্যোমিতি)।
শাকল্যঃ হাঁ, ঠিক কতজন? (কতোব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যতি?)
যাজ্ঞবল্ক্যঃ তিন জন। (এয় ইত্যোমিতি)
শাকল্যঃ হাঁ, দেবতারা ঠিক কত জন (কতোব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যতি?)
যাজ্ঞবল্ক্যঃ দুইজন। (দ্বাবিত্যোমিতি)
শাকল্যঃ হাঁ, ঠিক কত জন? (কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যতি?)
যাজ্ঞবল্ক্যঃ দেড়জন। (অধ্যর্ধ ইত্যোমিতি)
শাকল্যঃ হাঁ, ঠিক কত জন? (কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যতি?)
যাজ্ঞবল্ক্যঃ একজন। (এক ইত্যোমিতি)
আর ইহার আরো সংশয় দূর করা যায়
একই বহু হইয়াছেন আবার বহু প্রকাশের মধ্যে একই বিরাজমান আছেন, তাইতো বেদ বচনে "...একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি..." (ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৬) এবং ঋষিদের বাক্যে "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা" এবং "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি..." (কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠ উপঃ, ২/২/১২)।
এছাড়াও ঋগ্বেদ সংহিতায় ও ইহার ব্যাখ্যানে পাওয়া যায়,
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়.. অর্থাৎ, তিনি সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত হয়ে নানারূপ ধারণ করে ভিন্ন- ভিন্ন রূপে পৃথকভাবে প্রকাশিত হন। (ঋগ্বেদ ৬/৪৭/১৮)
আর 'একেশ্বরবাদী সনাতন ধর্ম'র আরো বহু ব্যাখ্যান রয়েছে-
ঋ.১/১৫৪/০৪।।
ঋ.১০/১১৪/০৫।।
ঋ.১০/৯০/০২।।
ঋ.১০/১২৯/০২।।

ব্রাহ্মীস্থিতি😇

বিঃ দ্রঃ ঋগ্বেদের ক্ষেত্রে শাকল শাখা হতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে (ইতি সম্পাদক)



পৌরাণিক গল্প ও রূপকথার গল্প এক নয়

অভিমন্যু সনাতন

আজকাল অনেকেই ধর্মীয় রূপকথা বা পৌরাণিক কাহিনীকে বাচ্চাদের রূপকথার গল্পের সাথে মেলান – এটা ঠিক না। কারণ পুরাণের সকল কাহিনী সব বয়সী মানুষের জন্য নয়, তবে কিছু ঘটনা বা কাহিনী শিক্ষামূলক। পৌরাণিক কাহিনীকে অস্বীকার করা মানে ধর্মকে অস্বীকার করা। অলৌকিকতাকে অস্বীকার বা ত্যাগ করতে গেলে ধর্মকে অস্বীকার/পরিত্যাগ করা হয়ে যাবে। দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ছাড়া ধর্ম হয় না। অনেক নাস্তিকরা অলৌকিকতা ও পৌরাণিক কাহিনীকে অস্বীকার করতে গিয়ে দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করে বা বর্জন করে। কিন্তু অনেক মুক্তমনা, বিজ্ঞানমনষ্ক ও নাস্তিকরাও আছে, যারা ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাস না করলেও দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে। আবার এমনও আছে যারা দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী কিন্তু ধর্মে নয়। হিন্দুদের কিছু সংগঠন আছে যারা শুধু বেদ ও বেদের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থকে মান্যতা দেয়, যদিও বেদও ঠিকঠাক। এনারা নিজেদের একেশ্বরবাদী ও প্রতিমাপূজার বিরোধী বলে প্রচার করে। অবাস্তবতা, অযৌক্তিকতা ও অশ্লীলতার অজুহাতে হিন্দু ধর্মের ১৮ পুরাণ ও উপপুরাণকে অস্বীকার করে। তারা অবতারবাদকে অস্বীকার করে। কিন্তু তারা হয়তো জানেন না যে শুধু পুরাণ ও উপপুরাণ নয়, বেদেও প্রতিমাপূজা ও অবতারবাদের কথা বলা আছে। তারা পশুবলিরও বিরোধীতা করে থাকেন, কিন্তু বেদ ও বৈদিক শাস্ত্রে এসবের বিধান আছে। তারাই এসব শাস্ত্রকে বিকৃত করেছে সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে, এমনকি অপপ্রচারও করে থাকে। পুরাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ প্রাচীন আর প্রাচীন ঘটনা বা ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থই মুলত পুরাণ। অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনা অন্যান্য ধর্মেও (আমাদের মতে সনাতনই একমাত্র ধর্ম) রয়েছে। মহাপ্রলয় বা মানবসভ্যতার শেষদিকে একজন আসবে, যার ফলে মানবসভ্যতার স্বর্ণযুগের সূচনা হবে – এমন অন্য সকল পরিচিত ধর্মের ধর্মগ্রন্থেও রয়েছে। যদিও সেগুলো শুধুমাত্র মত এবং আমাদের সুপ্রাচীন সনাতন ধর্ম থেকেই নেওয়া। কারণ এই একমাত্র সত্য, সনাতন ধর্ম দর্শন ও দার্শনিক যুক্তি নির্ভর এবং পুরাণে কথিত ঘটনাগুলোর অপব্যাখা এসব যুক্তির দ্বারা সহজেই দূর করা যায়।

নিম্নে বেদে অবতারবাদের প্রমাণ দেওয়া হলো শুধুমাত্র অপপ্রচারকারীদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য -
যিনি দিবাভাগের মতো প্রকাশিত থাকেন, তিন লোকের প্রতিপালক ও রক্ষক, যিনি তিন লোককে ধারণ করেন; তিনি অহিংস পরমাত্মা, অমর পরমাত্মা, তিনি জন্ম গ্রহণ করে (শরীর আকারে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তিনি সমৃদ্ধসম্পন্ন এবং একটি মননশীল (আত্মা) রূপে (যোনিতে) প্রকটিত হন।
[অথর্ববেদ - শৌনক শাখা - ৫/১/১]

আচার্য্য সায়ণ কৃত বেদ ভাষ্য অনুযায়ী উপরের অথর্ববেদের শৌনক শাখার মন্ত্রটি অনুবাদ করা হয়েছে। এই মন্ত্র অনুযায়ী ঈশ্বরের সাকার রূপের দিকেও ইঙ্গিত করা হচ্ছে। যিনি তিন লোকের প্রতিপালক, রক্ষক ও ধারণকর্তা, তিনি অবতার রূপ ধারণ করে প্রকটিত হন। - এটাই এই মন্ত্রের মূল বিষয়বস্তু।

বিঃ দ্রঃ পুরাণ বিষয়ক এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আশা করি আপনাদের জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে।





পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা ও লীলা

পৃথা সান্যাল

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
— শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৪/৭

ভাবানুবাদ: যুগে যুগে যখন ধর্মের ক্ষয় হয়, যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তখনই জন্ম নেন তিনি – অবিনশ্বর কৃষ্ণ।

মথুরা তখন শূরবংশ আর যদুবংশের গর্ব। শূরবংশের রাজা ছিলেন রাজা শূরসেন এবং যদুবংশের রাজা ছিলেন রাজা উগ্রসেন। উগ্রসেন ছিলেন ন্যায়বিচার আর প্রজাহিতের জন্য সুপরিচিত। প্রজারা তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। তাঁর পুত্র কংস ছোট থেকেই দুর্দান্ত ও প্রবল পরাক্রান্ত। এই শক্তি আর বুদ্ধির গর্বের ফলে তার মনে অহংকার বাসা বাঁধে । যত বড় হতে থাকে কংস, ততই তার হৃদয় কঠিন হয়ে ওঠে। সে নিজের শক্তি আর কৌশলের জন্য অজেয় হয়ে উঠেছিল, আর সেই অহংকার তাকে ঠেলে দেয় পাপের পথে। সময় গড়াল। শূরসেনের কন্যা দেবকীর সঙ্গে বিয়ে হয় বসুদেবের — যিনি ছিলেন যদুবংশের শ্রেষ্ঠ বংশধরদের অন্যতম, বুদ্ধিমান, সত্যনিষ্ঠ ও তেজস্বী। রাজা উগ্রসেনের নির্দেশে সেই শুভবিবাহ রাজমহলে উদযাপিত হয় আনন্দে, উৎসবে, বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনিতে। কিন্তু সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রিয় বোন দেবকীকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে ভাই কংস নিজেই যখন রথের লাগাম হাতে নিয়ে রওনা দিল । যাত্রার পথে হঠাৎ শোনা গেল ভয়ঙ্কর আকাশবাণী —

"ওহে মূর্খ কংস! যাকে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিস, তারই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোর মৃত্যু অনিবার্য করবে!"

ভ্রাতৃত্ব, প্রীতি, স্নেহ এক নিমেষে মুছে গেল কংসের মন থেকে। সে তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়াল — নিজের আদরের বোনের চুলের মুঠি ধরে হত্যা করতে উদ্যত হল। বসুদেব তখন শান্ত স্বরে, বুদ্ধির জোরে তাকে থামালেন। বললেন —"ভ্রাতা! দেবকী তোমার শত্রু নয় — তার গর্ভের সন্তানই তোমার কাল হবে। তাকে বাঁচিয়ে দেও, আমি অঙ্গীকার করছি — যত সন্তান জন্মাবে, সবাইকে তোমার হাতে তুলে দেব। এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না।"

কংস জানত, বসুদেব মিথ্যা বলেন না। তাই সে আপাতত বোনকে হত্যা থেকে বিরত হলো, কিন্তু ভয় আর সন্দেহ তার অন্তর থেকে গেল না। সে দেবকী আর বসুদেবকে লোহার শিকলের কারাগারে বন্দি করে রাখল ।

কংস তখন শুধু অহংকারী নয়, নরাধমের চূড়ান্ত রূপ। দেবকীর প্রথম সন্তান জন্মের পরই বসুদেব বুক ভরা কান্না চেপে সন্তানকে কংসের হাতে তুলে দিলেন — নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করতে। নিষ্ঠুর কংস এক মুহূর্ত দেরি না করে নবজাতক শিশুকে হত্যা করল। এইভাবে একে একে দেবকীর ছয় পুত্র জন্মালেন আর কংসের হাতে প্রাণ হারালেন। মাতৃক্রন্দনে প্রাসাদের দেয়াল কেঁপে উঠত, কিন্তু পাষাণ হৃদয়ে কংসের তাতে বিন্দুমাত্র করুণা জাগল না। এদিকে দেবর্ষি নারদ কংসকে সতর্ক করে বললেন—

“দেবতারা যদুবংশে জন্ম নিচ্ছেন। নন্দ, বসুদেব, যশোদা — এরা কেউ সাধারণ মানুষ নয়। শীঘ্রই তোর কাল রূপে জন্ম নেবে স্বয়ং বিষ্ণু।”

এইবার কংসের আতঙ্ক চরমে পৌঁছাল। সে নিজের পিতা উগ্রসেনকেও সিংহাসনচ্যুত করে অন্ধকার কারাগারে বন্দি করল। সমস্ত শূরমন্ডল দেশজুড়ে কংসের দাপট আর অত্যাচারের সীমা রইল না। সিংহাসনে বসল কংস — যদুবংশের কলঙ্ক, মথুরার কালরাত্রি।

কংসের সাথে জরাসন্ধ, ভৌমাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, তৃণাবর্ত, পূতনা, কেশী, ধেনুক, মুষ্টিক, অরিষ্টাসুরের মতো ভয়ঙ্কর রাক্ষসরা আর অসংখ্য দানব একে একে তার মিত্র হয়ে উঠল। মথুরা নগরীর চারপাশ যেন কালো ছায়ায় ঢাকা পড়ল। যদুবংশের বহু মানুষ দেশ ছেড়ে কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে পালিয়ে গেল, প্রাণের ভয়ে। তবু অনেকে থাকল — বাহ্যত কংসের অনুগত সেজে, ভয়ে মুখে কিছু না বলে।

কিন্তু মহাকালের চক্র তখন ঘুরছে নিঃশব্দে। ঠিক তখনই অনন্ত শয্যার অধীশ্বর, ভগবান শ্রী বিষ্ণুর অংশভূত স্বয়ং শেষনাগ দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হলেন — তিনিই হবেন বলরাম। আর অষ্টম গর্ভে আসতে চলেছেন — স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বিনাশ করবেন কংসের এই অশুভ রাজত্ব। কারাগারের পাথুরে দেয়ালে, শিকলের জিঞ্জিরে বাঁধা থাকলেও বসুদেব-দেবকীর হৃদয়ে তখন আশার প্রদীপ জ্বলতে শুরু করল — যিনি আসছেন, তিনিই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করবেন। তাঁর (বলরামের) আবির্ভাবে দেবকীর মন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু সাথে সাথে চিন্তার কালো ছায়া ফেরত এল — কংস যদি তাকেও মেরে ফেলে! ভগবান তখন যোগমায়াকে আহ্বান করলেন। বললেন —

“দেবী! তুমি ব্রজভূমিতে যাও। নন্দের গৃহিণী রোহিণীর গর্ভে এই গর্ভকে স্থানান্তর করো। আমি নিজে দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হবো।” (ভাগবত পুরাণ ১০.২.৭–১০)

যোগমায়া প্রণাম করে আদেশ পালন করতে গেলেন। দেবকীর গর্ভের সন্তান গোপনে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হলো। শহরবাসীরা ভাবল — দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়েছে! কেউ জানল না যে সেই শিশুই পরবর্তীতে বলরাম নামে জন্ম নেবেন।

এদিকে বসুদেবের হৃদয় তেজে দীপ্ত হল — ভগবান স্বয়ং তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠান নিলেন। আর সেই জ্যোতি তিনি দেবকীর গর্ভে সঞ্চার করলেন। শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী নিজ গর্ভে ধারণ করলেন সেই চিরসত্য, চিরজ্যোতিঃ চেতনাকে। কারাগারের অন্ধকারে, লোহার শিকলের আঁধারে, সেই গর্ভে জন্ম নিল নিখিলবিশ্বের আলো। দেবকীর মুখে অদ্ভুত শোভা ফুটে উঠল, তাঁর মুখ পবিত্র হাসিতে দীপ্ত হল। কারাগার যেন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল — আর সেই আলো দেখে কংস বুঝল, এবার সত্যিই তার মৃত্যু খুব কাছে। কিন্তু সে কিছুতেই দেবকীকে হত্যা করতে পারল না। একে তো সে বোন, তার ওপর গর্ভবতী — বীরপুরুষের জন্য এ কলঙ্ক। তাই সে স্থির করল — সে অপেক্ষা করবে। যতক্ষণ না সেই সন্তান জন্ম নিচ্ছে, সে নিজে পাহারা দেবে।

এভাবে কংস দিনে রাতে, খাওয়া-শোয়া ভুলে — সর্বদা কৃষ্ণকে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে রইল। তার চোখে কৃষ্ণ, স্বপ্নে কৃষ্ণ, আতঙ্কে কৃষ্ণ — এইভাবে নিজের অজান্তেই সে শত্রু কৃষ্ণের ধ্যানেই নিমগ্ন হয়ে গেল। অন্যদিকে, দূর স্বর্গলোকে দেবতারা বুঝলেন — এই পৃথিবীকে রক্ষার সময় উপস্থিত। দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মা, মহাদেব, নারদ — সকলে মিলে কারাগারে এসে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করতে লাগলেন –

“হে জগন্নাথ! আপনি জন্মহীন, তবু জগৎকল্যাণে লীলা করে জন্ম নেন।
আপনার পদপদ্মের ছোঁয়ায় এই ধরিত্রী ধন্য হবে — হে দয়াময়, আমাদের সকলের রক্ষা করুন!”

দেবকীর চোখে তখন অশ্রু — আনন্দ আর আশার অশ্রু। গর্ভে যিনি আছেন, তিনি শুধু দেবকীর নয় — সমগ্র ভুবনের নাথ। বন্ধনের কারাগার ভেঙে যিনি আসবেন — হরি রূপে, শ্যামসুন্দর রূপে। এভাবেই অনন্ত অন্ধকারের

মধ্যে কৃষ্ণ-জ্যোতি প্রসারিত হতে লাগল — এক নতুন ভোরের অপেক্ষায়, এক নতুন যুগের আশায়। রাত্রির অতল ঘন অন্ধকার যেন ক্রমেই নতজানু হলো, শিকলের ঝনঝন শব্দও থমকে গেল — ঠিক তখনই প্রকৃতির বুকে অদ্ভুত পরিবর্তন শুরু হল। নদী-নালা, সরোবরের জল একরাতেই স্বচ্ছ হয়ে উঠল। পদ্মফুল অদ্ভুতভাবে রাত্রিতেই প্রস্ফুটিত হলো। গাছগাছালি নবপল্লবে সজ্জিত হয়ে গেল, বনভূমি ভ্রমর আর পক্ষীর মধুর সুরে মুখরিত হতে লাগল। পবিত্র সুগন্ধবাহী বাতাস বইতে লাগল, কংসের ভয়ে নিভে যাওয়া ব্রাহ্মণদের হোমাগ্নিও পুনরায় প্রজ্বলিত হল — যেন ঘোষণা করে দিল, অশুভ শক্তির অবসান আসন্ন। দূর স্বর্গলোকে দেব-দুন্দুভি বেজে উঠল — দেবতা, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা সকলেই গান গাইতে আর নৃত্য করতে লাগল। পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে দেবগণ বললেন — "অজন্মা জনার্দন আজ মানবরূপে আসছেন! সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে, মঙ্গল হবে জগতে।"

এদিকে কারাগারের সেই নিঃসঙ্গ, বন্ধনবদ্ধ অন্ধকার কুঠুরিতে — দেবকীর গর্ভ থেকে উদয় হল এক অনন্ত চন্দ্র — পরিপূর্ণ ষোড়শকলায়, চতুর্ভুজরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! শ্যামবর্ণ, মেঘসদৃশ কুন্তল, বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি — হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। পীতাম্বর পরিহিত, কিরীট ও কুন্ডলের আলোয় আলোকিত সেই শিশু নয় — স্বয়ং অনন্ত বিষ্ণু! বসুদেব বিস্ময়ে অভিভূত — চোখে জল, হৃদয় বিহ্বল। শৃঙ্খলবদ্ধ হাতজোড় করে তিনি বললেন —

"হে পরমপুরুষ! আপনি সমস্ত জগতের সাক্ষী, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অতীত। আপনি জন্মহীন, তবু আমাদের পুত্র হয়ে এলে! আমাদের গৃহ ধন্য হল, এই পাপী কংসের অত্যাচার থেকে আমাদের সকলকে রক্ষা করুন, হে জগন্নাথ!"

দেবকীর চোখেও তখন আনন্দ অশ্রু। তিনি কাতর কণ্ঠে বললেন–

"হে বিশ্বাত্মা! হে শ্রীবিষ্ণু! এই চতুর্ভুজ দিব্যরূপ প্রকাশ করবেন না — কংস জানতে পারলে আপনাকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। মানবশিশুর মতো রূপ নিয়ে লীলা করুন — এই কংসের ভয়ে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না!"

ভগবান স্নেহভরে বললেন —

"দেবী! সুতপা-পৃশ্নি রূপে, কশ্যপ–অদিতি রূপে, আর এবার বসুদেব–দেবকী রূপে — তিনবারই আমি তোমাদের পুত্র হয়েছি। এই জন্মেই আমি সমস্ত অন্যায়ের অবসান ঘটাবো।

তোমরা আমার রূপচিন্তন আর মাতৃস্নেহ — দুই-ই করবে। এইভাবেই তোমরা আমার পরমপদে অধিষ্ঠান করবে।"

এ কথা বলে ভগবান হেসে শয্যার উপরেই একেবারে সাধারণ মানবশিশুর রূপ ধারণ করলেন। ঠিক তখনই যোগমায়া — ভগবানের লীলা-মায়া — রোহিণীর গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে যশোদার গর্ভে স্থান নিলেন। কারাগারের সব দ্বার-দ্বাররক্ষীরা এক অদ্ভুত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। লোহার মোটা কপাট, শিকল আর তালা — সবই স্বয়ং খুলে গেল। বসুদেব নিঃশব্দে শিশু কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বৃষ্টি ঝরছে — আকাশে মেঘের গর্জন, আর পিছনে মাথার উপর অনন্ত শেষনাগ ফণা বিস্তার করে বৃষ্টির ফোঁটা রুখে রাখছে। ব্রজভূমির পথে অশ্বত্থ, কদম, যমুনার পাড় — সর্বত্র রাতের নিস্তব্ধতা। যমুনার জল স্রোতে উন্মত্ত, কিন্তু ভগবানকে দেখে সে নিজেই পথ ছেড়ে দিল — ঠিক যেমন একদা সমুদ্র শ্রীরামের জন্য পথ খুলেছিল। বসুদেব পার হয়ে এলেন গোকুলে, নন্দরাজের গৃহে। সকলেই গভীর নিদ্রায়, যশোদার শয্যায় জন্মানো নবজাত কন্যা শুয়ে আছে — তিনি কৃষ্ণকে শুইয়ে দিয়ে কন্যাটিকে কোলে নিয়ে আবার ফিরে এলেন সেই কারাগারে। সকলের অজান্তে — বিশ্বপালক এসে পড়লেন গোকুলে, রাখালপল্লীর মাঝে। আর শিকল, তালা — সব আগের মতো বসিয়ে বসুদেব ফের শিকলে জড়িয়ে বসলেন, যেন কিছুই হয়নি।

অথচ সত্যিই — সব কিছু বদলে গেছে। কারাগারের অন্ধকারেই জন্ম নিলো এক নতুন যুগ —

শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ — মুক্তির আলোক হয়ে — মর্ত্যের বুকে অবতীর্ণ হলেন। কারাগারের সেই রাতের পর, কংস বাইরে মুখে দয়া আর অনুশোচনার কথা বললেও ভিতরে ভিতরে আগুনের মতো জ্বলছিল। সে জানত — যেই শিশুটি এখনো বেঁচে আছে, সেই-ই তার মৃত্যু ডেকে আনবে। তাই সমস্ত যদুবংশে, গোকুল-ব্রজে একটিও শিশু বাঁচতে পারবে না — এমনই শপথ করল সে। তার নির্দেশে ভয়ঙ্কর সব রাক্ষস-দানব ছুটে গেল শহর থেকে গ্রাম, ব্রজ থেকে গোপবল্লভী — সর্বত্র। আর তাদের সবার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াল ছিল পুতনা। সে রূপে ছিল অদ্বিতীয়া সুন্দরী — দূর থেকে দেখে কেউ বুঝবে না তার প্রকৃত রূপ। কোমল মুখ, মধুর হাসি — অথচ স্তনে লুকানো ছিল কালবিষ!

এক রাতে চাঁদের আলোয়, শীতল বাতাসে ব্রজভূমি যখন নিদ্রায়, গোকুলের পথে শুঁয়োপোকার মতো ছায়া হয়ে নেমে এল পুতনা। গোপগ্রামে প্রবেশ করে সে একে একে ঘরঘর খুঁজতে লাগল — কার ঘরে শিশু আছে? কে বাঁচিয়ে

রেখেছে মৃত্যুর দূতকে? শেষে সে পৌঁছাল নন্দের বাড়িতে — যেখানে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ শুয়ে আছেন মাতৃক্রোড়ে । ঘরের দ্বার ছিল অবারিত — যেন সমস্ত লীলা নিজের নিয়মে ঘটে। যশোদা আর রোহিণী তখন গৃহকাজে ব্যস্ত, কেউ বুঝতেও পারল না এই মায়াবিনী কখন ঘরে ঢুকে পড়ল। বালক কৃষ্ণ তখন অনিন্দ্য শান্তিতে শুয়ে আছেন — ক্ষুদ্র হাত দুটি বুকের কাছে, মুখে শিশুর কোমল তৃপ্তি। পুতনা ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল — তার দুগ্ধবতী স্তনের ডগায় লুকানো বিষ! সে শিশুকে কোলে তুলে স্তনপান করাতে উদ্যত হল — এই দুধ এক ফোঁটা খেলেই জীবন শেষ!

কিন্তু এ কোনো সাধারণ শিশু নয় — তিনিই স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! যেই না পুতনা তাকে স্তন দিল, অমনি কৃষ্ণ চোখ মেললেন — একটুখানি হাসি ফুটল মুখে। শিশুর মতোই তিনি স্তনপান করতে লাগলেন — কিন্তু সাথে সাথে শুরু হল ভয়ঙ্কর লীলা! পুতনার বিষ আর প্রাণশক্তি শুষে নিতে লাগলেন কৃষ্ণ। পুতনার চোখে তখন বিস্ময় — কী হচ্ছে! সে চেষ্টা করল শিশুকে ছাড়াতে, কিন্তু কৃষ্ণ শক্তভাবে স্তন আঁকড়ে ধরে রইলেন — ঠিক যেন মৃত্যুর ফাঁস! পুতনার রূপ ভেঙে গেল — সুন্দরী রূপ মিলিয়ে গেলো, প্রকট হল আসল রাক্ষসী মূর্তি — বিশাল দেহ, লাল চোখ, পাকানো চুল, রক্তমাখা নখ! সে চিৎকার করতে করতে গোকুল কাঁপিয়ে তুলল — গৃহ থেকে বাইরে ছুটে এল যশোদা-রোহিণী, নন্দ আর গোপগণ।

সবাই দেখল — শ্যামসুন্দর শিশু কৃষ্ণ পুতনার স্তন মুখে চেপে ধরে আছেন, আর পুতনা ছটফট করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষে এক মর্মান্তিক আর্তনাদে পুতনা ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল — রাক্ষসী অজেয় ছিল, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে সে এক শিশু মাত্র! যশোদা আর রোহিণী কেঁপে কেঁপে কৃষ্ণকে কোলে তুললেন — তাদের প্রাণের শ্যাম তখন যেন হাসছেন, খেলছেন — যেন কিছুই হয়নি! পুতনার দৈত্যদেহ তখন পড়ে রইল — বিশাল, গাছের মতো ছড়ানো হাত-পা। গোকুলবাসী বিস্ময়ে হতবাক — এই শিশু কি সত্যিই সাধারণ? আর পুতনা? সে মৃত্যুর পরও কৃষ্ণের স্পর্শে মুক্তি পেল — কারণ ভগবানকে স্তনদানের ছলে সে যে ভাবে হোক সেবা করেছিল, সেই অপরূপ লীলা! সেই থেকে গোকুলের আকাশে বারবার শোনা যেতে লাগল — এই শিশুই সমস্ত অশুভের অবসান ঘটাবে।

এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রথম লীলা — পুতনাবধের মাহাত্ম্যে গোকুলের বাতাস শুদ্ধ হল, সমস্ত গোপ-গোপীদের মনে ভক্তির স্রোত গঙ্গার মতো প্রবাহিত হতে লাগল ।



গোকুলে তখন আনন্দের জোয়ার বইছে — নন্দের ঘরে যশোদার কোলে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ বেড়ে উঠছেন। নন্দযশোদার মনে সবসময়ই সন্তানের মঙ্গল কামনা, তাই কৃষ্ণের জন্ম-নক্ষত্রের দিন যশোদা এক বিশাল অভিষেক উৎসবের আয়োজন করলেন। গৃহ ভরে গেল গানের শব্দে, ঢোল-করতাল আর বীণার মধুর সুরে। ব্রজের গোপিনীরা এসেছেন গীত গাইতে, ব্রাহ্মণরা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করছেন — যেন সমস্ত গোকুল এই উৎসবে নিমগ্ন। সব শেষ হলে যশোদা বালক কৃষ্ণকে স্নান করিয়ে সযত্নে শুইয়ে দিলেন, তার ছোট্ট মুখে তখন ঘুম আর দুধের গন্ধ মিশে আছে। যশোদা মঙ্গলকাজ আর অতিথি অভ্যর্থনায় এত ব্যস্ত যে পুত্রের ক্ষুধার কান্না কানে পৌঁছাল না। এদিকে কৃষ্ণ মায়ের স্নেহের জন্য কাঁদতে লাগলেন, ক্ষুধায় বিরক্ত হয়ে শিশুর মতোই পা ছুঁড়ে মারলেন ওপরে রাখা শকটটায়। এশকটা এমনিতে কী? বাইরে থেকে দেখলে এক পুরনো গাড়ির মতো — তার উপর দুধ-দইয়ের পাত্র সাজানো, যেন গ্রাম্য সংসারের সরল চিত্র। কিন্তু কংস শয়তানি করে রেখেছিল — সেই শকটাটাই ছিল এক অসুর, শকটাসুর! সে রূপ বদলে অচেতন হয়ে পড়ে ছিল — সুযোগ বুঝে কৃষ্ণকে আঘাত করবে বলে। কিন্তু কৃষ্ণের পায়ের একটুখানি আঘাতেই সে শকট উল্টে গিয়ে ভেঙে চুরমার! দুধ,

দই, হাঁড়ি, কলস — সব একাকার! বিস্ময়ে ছুটে এল যশোদা, নন্দ আর গোপগণ — কীভাবে এমন হল? শিশু যে শুয়ে ছিল শকটের নীচে! আর খেলতে থাকা বালকেরা বলল — "ও-ই করেছে! কৃষ্ণ পা দিয়ে ঠেলে শকটটা ফেলেছে!" কেউ বিশ্বাস করল না বাচ্চাদের কথা — এমন ক্ষুদ্র শিশু আর এমন শক্তি? যশোদা ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোনো অশুভ গ্রহের উৎপাত। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের ডেকে শাস্ত্রীয় মন্ত্রে অভিষেক করালেন, স্বস্ত্যয়ন হোম হল, ব্রাহ্মণদের দান-পূজা — যা যা করলে শিশু নিরাপদ থাকে, সবই করলেন স্নেহময়ী মা। শকটটাকে আবার গোপেরা দাঁড় করাল, পাত্র সাজিয়ে দিল — যেন কিছুই হয়নি! কিন্তু কে জানত, শিশু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই ছোট্ট পায়ের ঠেলায়ই শকটাসুরের প্রাণ যায়! অসুর চুপিচুপি আসবে আর কৃষ্ণ তাকে ছাড়বেন — তা হয় না। যশোদা আর গোকুলবাসী ভাবলেন, হয়তো অশুভ প্রভাব কেটে গেল। কিন্তু কংস তো বসে নেই!

শকটাসুর মারা যেতেই এবার সে পাঠাল তৃণাবর্ত নামের আরেক দৈত্য — ঘূর্ণি বাতাসের মতো ছদ্মবেশে আসবে সে। একদিন যশোদা ছোট কৃষ্ণকে দোলায় বসিয়ে দোলাচ্ছিলেন, আদরের চুম্বন খাচ্ছিলেন । হঠাৎই মা দেখলেন — শিশুটি যেন গিরির মতো ভারী হয়ে যাচ্ছে! কোলে ধরে রাখা দায়! অবাক হয়ে মা ছেলেকে মাটিতে বসিয়ে রাখলেন — আর তখনই সেই সুযোগে তৃণাবর্ত তীব্র ঘূর্ণি হাওয়ার আকারে এসে পড়ল গোকুলে! মুহূর্তে ধুলোঝড় — আকাশ অন্ধকার, চারিদিক ধুলোয় অন্ধ! কে কোথায় আছে কেউ বুঝতে পারছে না। সেই অন্ধকারে তৃণাবর্ত শিশু কৃষ্ণকে তুলে নিল আকাশে — মনে মনে হাসছে, "আজ শেষ! একেই মারতে হবে!" কিন্তু কৃষ্ণ তো শ্যামসুন্দর, তিনি মৃত্যুগ্রাসে ধরা পড়েন? আকাশে উঠেই শিশু কৃষ্ণ দুহাতে সেই তৃণাবর্তের গলা চেপে ধরলেন! অসুরের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, ঘূর্ণি থেমে গেল — তৃণাবর্ত কাতর, শিশুর ওজনে সে নুইয়ে পড়ছে! শিশুর গলা জড়িয়ে ধরা শক্তিতে তার দম বেরিয়ে এল — আর সে মৃতদেহ নিয়ে আছড়ে পড়ল গোকুলে! ভয়ে কাঁদতে থাকা যশোদা আর গোপীরা তখনই দেখলেন — তৃণাবর্তের ভাঙা মৃতদেহ আর তার বুকে লাল নীলাম্বর শিশু কৃষ্ণ শোভা পাচ্ছেন — দিব্য হাসিতে যেন কিছুই হয়নি! ছুটে গিয়ে যশোদা কোল ভরলেন — বুক ভিজল চোখের জলে, আনন্দ আর বিস্ময়ে! কেউ কেউ বলল — "এই শিশুটি যেন ভগবান স্বয়ং! নাহলে এভাবে বাঁচে?"

একদিন যশোদা আবার কোলে নিয়ে দুধ পান করাচ্ছেন, শিশুর ছোট্ট মুখে বারবার চুম্বন খাচ্ছেন — হঠাৎ কৃষ্ণ হাই তুললেন, আর সেই হাইয়ে মুখ খুলল — যশোদা দেখলেন কী? সেই ছোট মুখের ভেতরেই গোটা বিশ্ব — আকাশ, সূর্য-চন্দ্র, নদী-পাহাড়, গাছ-পাখি-মানুষ — সব! মা যশোদা বিস্ময়ে স্তব্ধ — যেন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এ যে স্বপ্ন নয় — তাঁর লাল মুখেই সব জগতের ছায়া! তখনও তিনি বুঝলেন না — এই শিশু যে স্বয়ং জগৎপালক, যিনি নিজের লীলা করে যাচ্ছেন মায়ের কোলে শিশুর মতো! অদ্ভুত এই দর্শনের পর যশোদা এক মুহূর্তের জন্যও সন্তানকে ভগবান রূপে ভাবতে পারলেন না — মাতৃস্নেহ সব জ্ঞান ঢেকে দিল। তিনি ভাবলেন, "হায়! এ কী বিভ্রম? নাহ, আমার লাল তো আমারই, কোলের শিশু!" স্নেহমুগ্ধ মা আবার কৃষ্ণকে বুকে টেনে নিলেন, বুকের দুধ খাওয়াতে লাগলেন — যেন কিছুই হয়নি। কৃষ্ণও যেন মাতৃস্নেহে তৃপ্ত হয়ে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন। গোকুলবাসীর কাছে এই শিশু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আনন্দের মূল, তাদের জীবনের সর্বস্ব। কেউ জানে না, এই শিশুই জগতের আদি-অন্ত, স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর, যিনি অসুর বধের অজস্র লীলা করে অবতীর্ণ হয়েছেন।

কিছুদিন পর কংস আবার ষড়যন্ত্র করল। এবার সে পাঠাল বৎসাসুরকে — সে বাছুরের রূপ ধরে গোপালদের বাছুরদের মাঝে মিশে থাকবে, সুযোগ পেলে কৃষ্ণের ক্ষতি করবে। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম সব বুঝে গেলেন। কৃষ্ণ বাছুরদের চরাতে গিয়ে একদিন হঠাৎ বৎসাসুরকে বাম হাতে ধরলেন — আর একটি পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারলেন গাছে! বৎসাসুরের প্রাণ বেরিয়ে গেল, সে আসল রূপ ধরে মৃত হয়ে ঝুলে থাকল। গোপালোকেরা তখনো বুঝতে পারল না — শিশুরা খেলতে খেলতে কত কী করে ফেলে!

কংস থামল না। এবার সে পাঠাল বকাসুরকে — ভয়ঙ্কর বিশাল এক বকপক্ষী! সে এসে নদীর ধারে গোপালোকদের আক্রমণ করল। এক লাফে কৃষ্ণকে ধরে সে গিলে ফেলল! গোপালোকরা চিৎকার করে উঠল — কিন্তু মুহূর্তেই কৃষ্ণ বকের কণ্ঠনালী ফাটিয়ে বেরিয়ে এলেন! তারপর দুহাতে সেই বকাসুরের চঞ্চু ধরে ছিঁড়ে ফেললেন — বিশাল দেহ পড়ে রইল নদীর ধারে। গোপালোকরা হর্ষে চিৎকার করে উঠল — "জয় কৃষ্ণ! জয় কৃষ্ণ!" পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই মহৎ ও দয়ালু আবির্ভাব দেখে ব্রজবাসীরা যে আনন্দে আত্মহারা হল, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

কৃষ্ণ ও বলরাম তখন গ্রীষ্মের উষ্ণতায় ভরা বৃন্দাবনের অরণ্যে রঙিন ফুল আর মধুর সুরে ঘেরা পরিবেশে আনন্দময় সময় কাটাচ্ছিলেন। সেখানে গোপালক বালকেরা নানা খেলায় মেতে উঠেছিল; গান, নৃত্য, মল্লযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, ছড়া-কৌতুক সবই চলছিল। এই আনন্দময় পর্বে প্রলম্ব নামক এক অসুর গোপালোকের ছদ্মবেশে এসে তাঁদের

অপহরণের চেষ্টা করল। কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন সর্বজ্ঞ, তিনি অসুরকে চিনে নিয়ে বন্ধুর ছদ্মবেশে তাকে বধ করলেন। এভাবেই একের পর এক বিপদ মোকাবিলা করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা চলতে থাকে, যেগুলো ব্রজবাসীদের কাছে আনন্দ আর শান্তির উৎস।

অসুরবধের পর গোকুলবাসীর মনে সাময়িক শান্তি ফিরে এল, কিন্তু কংসের ষড়যন্ত্রের ধারা থেমে থাকেনি। একের পর এক অসুর এসে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের আনন্দ কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। সেই ধারাবাহিকতায় এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল বিষধর কালিয়নাগ। নাগদের প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মাসে একেকটি সাপ গরুড়কে ভিক্ষারূপে দিতে হতো। এতে গরুড় তাদের আক্রমণ করত না। কিন্তু অহংকারী কালীয়নাগ সেই নিয়মকে তুচ্ছজ্ঞান করল। সে গরুড়কে দেবার কথা যে সাপের, তাকে নিজেই ভক্ষণ করল, আর এই অন্যায় আচরণে গরুড় ভীষণ ক্রোধে ফেটে পড়ল। গরুড়ের আক্রমণ এড়াতে কালীয়নাগ আশ্রয় নিল যমুনার গভীর ও অগাধজলপূর্ণ হ্রদে—যেখানে মহর্ষি সৌভরির অভিশাপে গরুড়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেই হ্রদের কালো জলে কালীনাগের বিষ ছড়িয়ে পড়ল, চারপাশের জল দূষিত হয়ে উঠল, জলে থাকা জলজ প্রাণী মরতে লাগল, এমনকি গোকুলবাসীদের গরুগুলোও দূষিত জলপান করে আক্রান্ত হতে লাগল। এমন ভয়াবহ অবস্থায় একদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদের পাড়ে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, গোপালদের গরুগুলো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কৃষ্ণ অবিলম্বে সেই বিষাক্ত জলে ঝাঁপ দিলেন। ক্রোধান্ধ কালীয়নাগ কৃষ্ণকে পেঁচিয়ে ধরল, চারপাশে ফেনা আর বিষের ঢেউ উঠল। গোকুলবাসীরা ছুটে এল, তারা ভয় আর কান্নায় ভেঙে পড়ল—কৃষ্ণ কোথায়, তিনি কীভাবে বাঁচবেন! কিন্তু কৃষ্ণ তো সবকিছুর অধিপতি। হঠাৎই কালো জলের মাঝে উজ্জ্বল রূপে দৃশ্যমান হলেন তিনি। কালীয়নাগের পাঁচ ফণার উপর দাঁড়িয়ে তিনি নৃত্য শুরু করলেন। সেই নৃত্যে পদাঘাতের সাথে সাথে কালীয়নাগের অহংকার চূর্ণ হতে লাগল। একে একে ফণা নামিয়ে সে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণ তাকে জীবনের দয়া দিলেন, আশীর্বাদ করলেন, আর নির্দেশ দিলেন যমুনা ত্যাগ করে রমণীসহ রামণক দ্বীপে চলে যেতে। কালীয়নাগ চলে গেল, যমুনা শান্ত হল, গোকুলবাসী প্রাণ ফিরে পেল। সেই দিন কৃষ্ণ যেন প্রকৃতি ও প্রাণীর রক্ষক রূপে সকলের হৃদয় জিতে নিলেন।

এরপর আবারও গোকুলে ফিরে এল আনন্দের দিন। বৃন্দাবনের গ্রীষ্মের বনে কৃষ্ণ, বলরাম আর গোপালক বালকেরা আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। গানের সুর, মৃদু বাতাসে দুলতে থাকা বকুল-কৃষ্ণচূড়ার গন্ধে ভরা সে দিনগুলো ছিল অনাবিল সুখের। ছেলেরা খেলায় মেতে উঠত—গান, নৃত্য, কুস্তি, বাহুযুদ্ধ, ছড়া, মজার গল্পে গোকুল যেন ক্ষণিকের জন্য স্বর্গ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কংসের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। সেই আনন্দময় পরিবেশেই ছদ্মবেশে গোপালের ভেতর ঢুকে পড়ল প্রলম্ব নামের এক অসুর। সে বন্ধুত্বের ছলে কৃষ্ণ ও বলরামকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে চাইল। কৃষ্ণ জানতেন, কে বন্ধু আর কে শত্রু। ছদ্মবেশী অসুরের ছলনা ভেদ করে তিনি একপর্যায়ে বন্ধুত্বের অভিনয়ে তাকে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেললেন। প্রলম্বনামক এই ভয়ংকর অসুরেরও মৃত্যু হল, গোপালকরা উল্লাসে মাতল, আবারও গোকুলবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।



অসুর বধ করে একের পর এক বিপদ দূর করলেও, গোকুলবাসীর সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কংসের চক্রান্ত ক্রমেই ভয়াল হয়ে উঠছিল। সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ হিসেবে রাজা কংস তাঁর বিশ্বস্ত দূত অক্রুরকে পাঠালেন নন্দভবনে—কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় নিয়ে আসার জন্য। অক্রুর প্রাণভরে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করলেন, নদীর জলে স্নান করলেন আর সেই জলে ভগবানের অনুপম রূপ দর্শন করে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, জলে উদ্ভাসিত সেই রূপ নাট্যশালার অভিনেতার মতো হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে আবার অন্তর্হিত হয়ে গেল—যেমন করে স্বয়ং ভগবান তাঁর লীলার পর্দা তুলে ধরেন, আবার নামিয়ে নেন।

অক্রুরের বিস্ময় আর আনন্দ সীমাহীন। তিনি নদীর তীর থেকে রথে ফিরে এলে কৃষ্ণ সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন—



"পিতৃব্য! আপনি কি কিছু আশ্চর্য দেখেছেন?"
অক্রুর শান্ত মুখে মৃদু হাসি ফুটল। তিনি বললেন—
"হে কৃষ্ণ! এই জগতে যা কিছু আশ্চর্য—আকাশে, জলে, স্থলে—সবই তো আপনার মধ্যেই নিহিত। আপনিই বিশ্বরূপ। আপনাকে দেখে আর কীই বা অবাক হবার থাকে?"
এই কথা বলার পর অক্রুরের রথ আবার চলতে শুরু করল—বলরাম আর পরেমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মথুরার দিকে। পথের দু'ধারে গ্রামবাসীরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁদের নয়ন যেন কৃষ্ণ-বলরামের মধুর রূপ থেকে সরাতেই পারছিল না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ ছায়া, বলরামের শুভ্র দীপ্তি—দুই ভাই যেন দিনের আলো আর রাতের চাঁদের মতো। গোকুলবাসীরা আগেই মথুরার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছিল। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন—কৃষ্ণ আর বলরামের চোখের দেখা পাবে বলে।
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসিতে অক্রুরের হাত ধরে বললেন—
"তাত! আপনি আগে শহরে গিয়ে বিশ্রাম নিন, আমরা কিছুক্ষণ পরে নগরী দেখতে যাব।"
কিন্তু অক্রুর বিনীত কণ্ঠে বললেন—
"হে নাথ! আমি আপনাদের ত্যাগ করে একা যাব? আপনার চরণধূলিতে গৃহকে পবিত্র করুন। আপনার চরণযুগলই তো গঙ্গা, যা দেবতা-পিতৃপুরুষ সবাইকে তৃপ্ত করে। বলিরাজ যাঁর জলধারায় ধন্য হয়েছেন—আমার গৃহও সেই চরণামৃতে ধন্য হোক।"
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে আশ্বাস দিলেন—
"অবশ্যই আসব তাত! তবে আগে এই কংসকে বধ করতে হবে—যেন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই শান্তি পায়।"
অক্রুর গোপনে কংসের কাছে খবর দিলেন—দূত হিসেবে তাঁর কাজ শেষ। তারপর গৃহে ফিরে গেলেন। অপরাহ্নে কৃষ্ণ-বলরাম আর গোপালকরা নগরীর রাজপথে প্রবেশ করলেন। মথুরার নগরী সে এক স্বপ্নপুরী—স্ফটিকের প্রাসাদ, সোনার দরজা, তামা-পিতলের শস্যাগার, পুষ্পিত উদ্যান, চারদিকের গৃহে গঙ্গাজল-দধি-অক্ষত ছড়িয়ে স্বাগত সাজ। পথে পথে কলস, পুষ্পমাল্য, কলাগাছ, পতাকা—মঙ্গলচিহ্নে সজ্জিত। পুরনারীগণ কৃষ্ণ-বলরামের রূপদর্শনে উন্মাদ! কেউ অট্টালিকার ছাদে উঠে পুষ্পবর্ষণ করছেন, কেউ অর্ধ-সাজে ছুটে আসছেন। কেউ এক হাতে কঙ্কণ পরে, অন্য হাতে নেই; কেউ এক পায়ে নূপুর, অন্য পায়ে নেই—কিন্তু চোখে একটিই স্বপ্ন: কৃষ্ণ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মত্ত গজরাজের মতো দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নীল বর্ণ, মৃদু হাসি, প্রেমময় দৃষ্টি—সবাইকে মুগ্ধ করে নিচ্ছে। পুরনারীগণ মনে মনে বলছেন,
"কী ভাগ্য গোপীদের! এ রূপ প্রতিদিন দেখতে পায়!"
এদিকে রাজপথে দেখা হল এক গর্বান্ধ রজকের সঙ্গে। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—
"ভাই! আমাদের সুন্দর কিছু বস্ত্র দাও।"
কিন্তু রজক কংসের অহংকারে ভর করে কঠোর কথা বলল—
"তোরা জঙ্গলচারী রাখাল! রাজবস্ত্রের দিকে হাত বাড়াস? বেঁচে থাকতে চাস তো দূর হ।"
কৃষ্ণের চোখে একটুখানি ক্রোধ ঝলকে উঠল—এক চপেটাঘাতে রজকের মস্তক দেহ থেকে খসে পড়ল। তাঁর কর্মচারীরা ভয়ে কাপড়ের গাঁঠরি ফেলে পালাল। কৃষ্ণ-বলরাম সেই বস্ত্র থেকে পছন্দমতো বেছে পরলেন, বাকিগুলি সঙ্গীদের বিলিয়ে দিলেন। কিছুদূর এগিয়ে দেখা হল এক তন্তুবায়ীর সঙ্গে। কৃষ্ণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে রঙিন কাপড় দিয়ে দু'ভাইকে সাজিয়ে দিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ধন, ঐশ্বর্য আর মৃত্যুর পর সারূপ্যমুক্তি

দিলেন। এরপর তাঁরা পৌঁছালেন সুদামা নামে এক মালাকারের কাছে। সুদামা ভক্তিভরে প্রণাম করে পাদ্য, অর্ঘ্য, চন্দন, পুষ্পমালা দিয়ে ভক্তিসহকারে তাঁদের সেবা করল। ভগবান তাকে আশীর্বাদ করলেন—অচল ভক্তি, ভক্তদের প্রতি সৌহার্দ্য আর সকল জীবের প্রতি দয়া। মথুরার রাজপথে তখন ভোরের আলোয় ব্যস্ততা আর কৌতূহল ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম তাঁদের গোপসঙ্গীদের নিয়ে শহরে প্রবেশ করছেন। দু'ভাই রাজপথে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন —এক যুবতী, যার মুখখানি অপূর্ব সুন্দর অথচ দেহটি বেঁকেচুরে কুঁজাকৃতি। হাতে সে চন্দন আর সুগন্ধি অঙ্গরাগের পাত্র নিয়ে যাচ্ছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

— "হে সুন্দরী! তুমি কে? কার জন্য এই অঙ্গরাগ নিয়ে চলেছো? আমাদেরও একটু দেবে কি? দেখো, দিলে তোমারই মঙ্গল হবে!" (ভাগবত পুরাণ ১০.২২.১৭–২২)

যুবতীটি কুঁজ হলেও তার চোখে তখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখে অনন্ত বিস্ময় আর আকর্ষণ। সে মৃদু হেসে বলল,

— "প্রভু! আমি কংসের সেবাদাসী — আমার নাম ত্রিবক্তা। রাজা কংসের শরীরে অঙ্গরাগ লাগাই আমি। তবে আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, এ অনুলেপনের সবচেয়ে যোগ্য অধিকারী আপনারাই। আপনারা দু'জনই যদি নেন, তাহলে তাতেই আমার জীবনের সার্থকতা!"

ত্রিবক্তা নিজের হাতে বানানো সেই উৎকৃষ্ট চন্দন-অঙ্গরাগ প্রিয়ভাজন ভগবান আর বলরামের হাতে তুলে দিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নিজেরা তা শরীরে মেখে নিলেন। তাঁদের শ্যাম আর গৌরবর্ণ দেহে সেই অঙ্গরাগের উজ্জ্বলতা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপাসাগর। তিনি দেখলেন, সুন্দর মুখ নিয়ে এই মেয়েটি দেহের বিকলতার জন্য সমাজে কত অবহেলিত! তাই লীলাচক্রে ত্রিবক্তার ভাগ্য বদলে দিতে চাইলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পদযুগল দিয়ে ত্রিবক্তার পায়ের আঙুল দু'টোকে মৃদু চেপে ধরলেন আর এক হাতে তাঁর কুঁজো দেহটিকে চিবুকের কাছে ধরে সোজা করে দিলেন। মুহূর্তেই সেই বঙ্ক দেহ সোজা হয়ে গেল — আর ত্রিবক্তা পরিণত হল অপূর্ব সুনয়না সুন্দরী যুবতীতে! তার চোখে তখন অবাক আনন্দ আর প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি। কুঁজো দাসী ত্রিবক্তা তখন আর শুধু কংসের সেবাদাসী নয় — সে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, প্রেমাসক্তা। লাজে লাল হয়ে সে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ করে বলল,

— "প্রভু! আমার গৃহে আসুন। এই ক্ষুদ্র জীবন আপনাকে সেবাই করুক। আপনার স্পর্শে আজ আমি পূর্ণ হয়েছি, এবার আপনার প্রেমেই পূর্ণ হই।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন। চারপাশের গোপসঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন,

— "হে সুন্দরী! আমি অবশ্যই তোমার গৃহে আসব। তবে এখন আমার কাজ আছে। আমি কাজ শেষ করে তবেই আসব। গৃহহীনের আশ্রয়ই তো গৃহিণী!"

সান্ত্বনার মধুর বাণী শুনে ত্রিবক্তা চোখ ভেজাল প্রেমাশ্রুতে। এদিকে রাজপথ ধরে শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম এগিয়ে চললেন মথুরা নগরীতে। পথে বণিকেরা তাঁদের দেখে পান, পুষ্পমালা, চন্দন প্রভৃতি উপহার দিয়ে পূজা করল। নগরীর নারীরা দলে দলে ছুটে এলো তাঁদের একবার চোখ ভরে দেখতে। কে যেন বলল —

— "কৃষ্ণ আর বলরাম! এই দুই কিশোরই গোপিনীদের তপস্যার ফল। কত ভাগ্য গোপিনীদের!"

এভাবে এগিয়ে তাঁরা পৌঁছালেন সেই ধনুর্যজ্ঞ স্থানে, যেখানে বিশাল ইন্দ্রধনুর মতো ধনুক রাখা। সেটি পাহারা দিচ্ছিল বহু সশস্ত্র সৈন্য। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাছে গিয়ে একটুখানি হাসলেন, তারপর এক হেঁচকায় সে ধনুক উঠিয়ে নিয়ে অদ্ভুত দক্ষতায় এক লাফে তাতে জ্যা লাগিয়ে ফেললেন — আর মুহূর্তেই সেটি ভেঙে ফেললেন দু'টুকরো করে! ধনুক ভাঙার শব্দে মথুরা প্রকম্পিত! কংস আতঙ্কে কেঁপে উঠল। রক্ষীরা তেতে উঠল —

— "ধরো! এই বালকদের ধরে ফেলো!"

কিন্তু কৃষ্ণ বলরামের তেজের কাছে তাদের কোনো সাধ্য ছিল না। ধনুকের ভাঙা অংশ হাতে নিয়ে দু'ভাই রক্ষীদের বধ করতে লাগলেন একে একে। শেষমেশ ধনু ভাঙার কাজ শেষ করে দু'ভাই মথুরা শহর ঘুরে দেখলেন — রাজপ্রাসাদ, অলংকৃত রাজপথ, ব্যস্ত বাজার, জনতার উল্লাস। সূর্য ডুবতে ডুবতে তাঁরা আবার গোপদের সঙ্গে গিয়ে শিবিরে ফিরলেন। এভাবে মথুরাবাসীরা সেদিন কৃষ্ণ-দর্শনের যে সৌভাগ্য পেল, তা ত্রিলোকের দেবতারাও সহজে পায় না। মথুরা তখন উৎসবের নগরী। ধনুর্যজ্ঞের রঙ্গভূমি গমগম করছে ঢোল, নকুল আর শঙ্খধ্বনিতে। হাজার হাজার চোখ তখন কৃষ্ণ আর বলরামের দিকে। এদিকে চাণূর আর মুষ্টিক—কংসের দুই ভয়ঙ্কর মল্ল — দাঁত খিঁচিয়ে

অপেক্ষা করছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসিমুখে চাণূরের দিকে এগিয়ে গেলেন, আর বলরাম গম্ভীর ভঙ্গিতে মুষ্টিকের দিকে। মল্লযুদ্ধ শুরু হতে না হতেই চারপাশ থমথমে হয়ে উঠল। দুই মল্ল আর দুই বালক—প্রথমে কেউ ভাবতেই পারেনি কী হতে যাচ্ছে! চাণূর কৃষ্ণকে দুই হাত দিয়ে এমন টানছে যেন একটানে ছিন্ন করবে। কৃষ্ণও পিছিয়ে যাচ্ছেন না—দুই হাতে চাণূরের হাত চেপে ধরলেন। কখনো কাঁধে কাঁধ, কখনো বুকে বুক, কখনো হাঁটুতে হাঁটু—সারা অঙ্গজুড়ে আঘাত আর আঘাত! বলরাম আর মুষ্টিকও একে অপরকে ধরাধরি করে আছাড় মারছেন। কখনো ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছেন, কখনো শূন্যে তুলে আছাড়! চারপাশে উত্তেজনা চরমে। রাজবৈঠকে বসে থাকা মহিলারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। কিশোর কৃষ্ণ আর বলরামের কোমল দেহ—এই রাক্ষুসে মল্লদের সঙ্গে কীভাবে লড়বে! মথুরার রমণীরা কাতর গলায় বলতে লাগল—

"কৃষ্ণ আর বলরামের অঙ্গগুলো দেখো! কোমল পদ্মের মতো! আর চাণূর-মুষ্টিক! পাহাড়ের মতো কঠিন চেহারা! এ কি অন্যায় নয়? এই সভায় এ অন্যায় দেখেও সবাই চুপ!"

কারাগারের অন্ধকারে বসে বসুদেব আর দেবকীও বন্দী কক্ষ থেকে শুনলেন বাইরে ভিড়ের ফিসফাস। তাঁদের বুক কেঁপে উঠল — পুত্রদ্বয়ের ক্ষতি হবে না তো? এদিকে রঙ্গভূমিতে কৃষ্ণ আর চাণূরের লড়াই চরমে পৌঁছাল। চাণূর কৃষ্ণকে বাজপাখির মতো লাফিয়ে বুকে আঘাত করল। কিন্তু কৃষ্ণ? যেন কিছুই হয়নি! স্থির, স্থাণু, বজ্রদেহ! কৃষ্ণ মৃদু হাসলেন, চাণূরের দুই হাত চেপে ধরে এক লাফে তাকে শূন্যে তুলে নিলেন। তারপর আকাশে পাক খাওয়াতে খাওয়াতে সজোরে মাটিতে আছাড় মারলেন! বিশাল চাণূর পুতুলের মতো পড়ে রইল মাটিতে—ভগ্ন ইন্দ্রধ্বজের মতো! বলরামও মুষ্টিককে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাতে ফেলে দিলেন। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এল, মুষ্টিক ঝড়ে ভাঙা গাছের মতো লুটিয়ে গেল। এরপর কূট নামের আরেক মল্ল ছুটে এলো, বলরাম তাকে বাঁ হাতেই এক ঘুষিতে শেষ করে দিলেন। দুই ভাই এখন অপ্রতিরোধ্য। শল আর তোশল শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করতে এলো—কৃষ্ণ এক পায়ের আঘাতে শলকে শেষ করলেন, আর তোশলকে দুই টুকরো করে চিরে ফেললেন! মল্লরা সবাই পালাতে লাগল!

জয়মাল্য পরে গোপবন্ধুরা নেমে এলো মঞ্চে। কৃষ্ণ আর বলরাম তাঁদের নিয়ে তূর্যবাদ্যের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন—নূপুরের ঝংকার আর হাসির রোল! কিন্তু কংস? তার চোখে রক্ত! প্রিয় মল্লেরা মরেছে, গোপেরা আনন্দ



করছে—সে আর সহ্য করতে পারল না। দাঁত মুখ শক্ত করে সে চিৎকার করে উঠল—

"এই দুই গোপপুত্রকে এখনই নগর থেকে বের করে দাও! বসুদেবকে মেরে ফেলো! নন্দকে বেঁধে আনো! উগ্রসেনেরও রেহাই নেই!"

তার উন্মাদ নির্দেশে সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। কৃষ্ণ আর চুপ থাকলেন না। রক্তিম চোখে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মতো এক লাফে সেই উঁচু রাজমঞ্চে উঠে গেলেন, যেখানে কংস আতঙ্কে ঢাল-তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়েছিল। কংস শেষ শক্তি দিয়ে ডান-বামে ছুটে তরোয়াল চালাতে লাগল। কৃষ্ণ একপলকে তার কেশ ধরে টেনে মঞ্চ থেকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর সেই বিশ্বাশ্রয় ভগবান নিজেই কংসের বুকে লাফিয়ে পড়লেন—দিগন্তজুড়ে যেন বজ্রপাত! অহঙ্কারী কংসের শ্বাস থেমে গেল—কৃষ্ণ তার দেহটিকে মাটি দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেন সিংহ যেমন হস্তীকে টেনে নিয়ে চলে।

সারা সভা স্তব্ধ! শুধু স্তব্ধ নয়—প্রাণভয়ে চিৎকার! কংসের ভাইরা ছুটে এলো প্রতিশোধ নিতে। বলরাম হাতে পরিঘ তুলে নিলেন—এক এক আঘাতে সবাইকে শেষ করলেন! আকাশ থেকে তখন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করছেন। অপ্সরারা নাচছেন। ধ্বনিত হচ্ছে 'জয় শ্রীকৃষ্ণ!'

কংসের রাণীরা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন। মৃত স্বামীদের

জড়িয়ে ধরে বুকফাটা কান্না—'হে প্রিয়! হে নাথ! সর্বনাশী অধর্মের ফল এ-ই!' কৃষ্ণ কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিলেন—তাদের চোখের জল মুছিয়ে বললেন—'ভয় নেই! তোমরা শোক ছেড়ে দাও।' শেষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দেবকী-বসুদেবকে কারাগার থেকে মুক্ত করলেন। পুত্রেরা প্রণত মস্তকে পিতামাতার চরণ ছুঁলেন—কিন্তু মা-বাবা শঙ্কিত! যে পুত্র জন্মেই কারাগারে বন্দী হল, সে আজ স্বয়ং জগদীশ্বর হয়ে দাঁড়িয়েছে! মথুরার আকাশে তখনও পুষ্পবৃষ্টি—বজ্রগর্জন নয়, ধ্বনিত হচ্ছে 'জয় মধুসূদন! জয় ভগবান!' কংসবধের পর মথুরার বাতাসে নতুন প্রাণ ফিরল। যে নগরীতে এতকাল অন্ধকার আর ভয়, সেখানে আলো আর স্বস্তির শ্বাস ফিরে এল। কৃষ্ণ-বলরাম মথুরা রাজগৃহে বসুন্ধরা,দেবকী আর উগ্রসেনকে নতুন করে রাজগৌরবে প্রতিষ্ঠা করলেন। উগ্রসেন হলেন আবার রাজা—কংসের দম্ভের স্থানে স্থাপিত হল ধর্ম আর ন্যায়ের শাসন।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয় কৃষ্ণের মথুরা-লীলা।

কংসের মৃত্যুর পরও মথুরার মানুষের শত্রু শেষ হয়নি—জরাসন্ধ, কংসের শ্বশুর, বারবার মথুরা আক্রমণ করতে লাগল। একবার, দুইবার নয়, সাতাশবার! প্রতিবার কৃষ্ণ-বলরাম মথুরাকে রক্ষা করলেন, কিন্তু মানুষের শান্তি আর ফিরল না। শেষে ভগবান বুঝলেন—মথুরা থেকে দূরে গিয়ে নতুন রাজধানী গড়তে হবে। তিনি সাগরের বুকে স্থাপন করলেন নতুন স্বর্ণপুরী দ্বারকা। অজেয় শত্রুদের হাত থেকে গোপদের, যাদবদের রক্ষা করতে কৃষ্ণ স্থাপন করলেন সেই অনন্য নগরী—সমুদ্রের ঢেউয়ে বেষ্টিত, দুর্গম, অপার ঐশ্বর্যময়।

দ্বারকায় কৃষ্ণের আরেক নতুন লীলা—রুক্মিণীহরণ। বিদর্ভরাজ ভবরের রাজকন্যা রুক্মিণী—জগতে কৃষ্ণভক্ত রমণীদের মধ্যে প্রথমা। মনেপ্রাণে তাঁকে স্বামী মানতেন কৃষ্ণকেই। কিন্তু রুক্মিণীর ভাই রুক্মী চেয়েছিল শীশুপালের সঙ্গে বিয়ে দিতে। রুক্মিণী গোপনে এক ব্রাহ্মণ পাঠালেন দ্বারকায়—'হে প্রিয় কৃষ্ণ! আমি শুধুই আপনার। আসুন, আমাকে বিয়ে করে নিয়ে যান।' ব্রাহ্মণ দূত ফিরে এল—কৃষ্ণ হাসলেন, সাথে সাথে সজ্জিত হলেন রথে। বিদর্ভপুরীতে পৌঁছে, রাজসভায় সকলের চোখের সামনে রুক্মিণীকে বিয়ের মণ্ডপ থেকে হরণ করে নিয়ে এলেন! রুক্মী তাড়া করে এলে বলরাম তাকে জয় করলেন—রুক্মিণী হলেন কৃষ্ণপত্নী, জগতে 'পতিব্রতা' শব্দের নতুন অর্থ দিলেন। কৃষ্ণ-লীলা শুধু যুদ্ধ আর রাজনীতির নয়—তা প্রেম আর ভক্তিরও অনন্ত সমুদ্র। একবার নারদ মুনির অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ গেলেন ধ্রুবের সঙ্গে দেখা করতে—ধ্রুব, সেই বালক যে মাত্র পাঁচ বছরে প্রভুকে দর্শন করেছিল। আরেকবার শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের কুটিরে যান—রাজাদের অঢেল প্রাসাদ ছেড়ে কৃষ্ণ খেলেন বিদুরের গৃহে ফলমূল আর অনাহারী ভক্তির অমৃত! জীবনভর কৃষ্ণ খেলেছেন, রাজ্য রক্ষা করেছেন, প্রেম দিয়েছেন, শত্রু বধ করেছেন। শেষ বেলায় দ্বারকায় বসল ভীষণ যাদবযুদ্ধ—এক পেয়ালা মদ আর অভিশাপের পরিণতিতে সব যাদব বংশের নাশ। স্বয়ং কৃষ্ণও তখন ধ্যানমগ্ন, একটি বাণ এসে তাঁর পদ স্পর্শ করল—জগৎ সংসারের সব লীলা ত্যাগ করে কৃষ্ণ স্বধামে প্রস্থান করলেন।



শুধু প্রস্থান নয়, সে এক নব জাগরণ—ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ চিরন্তন। তিনি নেই বলে কেউ কখনো বলতে পারবে না—কারণ বৃন্দাবনের সেই বেণু, মথুরার যুদ্ধ, দ্বারকার রাজসিংহাসন—সবই আজও ভক্তহৃদয়ে জাগ্রত। ভক্ত প্রহ্লাদ থেকে শুরু করে বৃন্দাবনের গোপী এমনকি ত্রিভুবন বিজেতা অর্জুন, সকলেই আমাদেরকে ভাগবতের অন্তিম শিক্ষা



শেখায়: প্রেমই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই প্রেম। যে এই প্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে, সে কখনো মরতে পারে না—সে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত চরণে চিরশান্তির আশ্রয় পায়।
জয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়! জয় সনাতন!

তথ্যসূত্র:-

১) শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবত মহাপুরাণ - স্কন্ধ ১, ৪, ৭, ১০, ১১
২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - ৪র্থ অধ্যায়





শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ও যোগেশ্বর উভয়ই

অর্ণব দত্ত

আমাদের এই হিন্দু সমাজে কিছু সংগঠন থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত কিছু লোক মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন কেবল যোগেশ্বর এবং পরামাত্মা/পরমেশ্বর কেবল নিরাকার। তবে তারা যোগেশ্বর দ্বারা মূলত এমন কাউকে বুঝায় যে যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন, এক কথায় যোগী। যদিও যোগেশ্বর শব্দ দ্বারা কেবল যোগী বা যোগীপুরুষ এমন বুঝায় না তাও আপাতত এমন অর্থই ধরে নিচ্ছি। তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্বের অন্তর্গত ষোড়শ অধ্যায়ের ১৩ তম শ্লোক উল্লেখ করেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে তাঁর নিজের যোগযুক্ত থাকার বিষয়ে বলছে। এবং তার কিছু আগে অর্জুন কে তিরস্কার করেছে কারণ তিনি গীতার জ্ঞান বিচলিত চিত্তের কারণে ভুলে গিয়েছিলেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ উক্ত কথাগুলো, লীলাবশত বলেছেন, এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যাতে জগৎ কে তিনি ভগবদগীতার মাহাত্ম্য বোঝাতে পারেন। যদি আমি সেই কথাটা একদম as it is ধরে নেই, তাহলে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে যায় যে শ্রীকৃষ্ণ কেমন যোগেশ্বর যে সর্বাবস্থায় যোগযুক্ত হতে পারেন না? আর শ্রী কৃষ্ণ, দেবাদিদেব মহাদেব(মহেশ্বর) - তাঁরা সবাই তত্ত্বতঃ একই। একই সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম লীলাবশত বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আছেন। মহাভারতেই মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ কে "মহেশ্বর" বলেছেন; "ব্রহ্ম" বলেছেন(গীতাপ্রেস মহাভারত অনুশাসনপর্বের দান-ধর্ম উপপর্বের, ১৪৭ অধ্যায়, শ্লোক ৮-৯)।

আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ গীতা আছে। এই গীতাসকল দ্বারা গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে, রুদ্র-নারায়ণের যুগল মূর্তি প্রকাশ হয়েছে। মহাভারতে আরো এক জায়গায় বলা হচ্ছে :-

‘He cheerfully met Rudra. He was worshipped by the rishis, Brahma and the gods. Hari, the lord of the universe spoke to the god Ishana. He who knows you, knows me. He who follows you, follows me. There is no difference between you and me.Do not think other-

wise.Your spear will leave the srivatsa mark on my chest.'
[BORI CE - Moksha Dharma Parva - Chapter 1658(330)]
যাই হোক, Back to the point--
নীচে আমি গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্বের অন্তর্গত ৫১ তম অধ্যায়ের ৪৯-৫০ শ্লোক দিচ্ছি -
৪৯. মহাবাহু(অর্জুন)! এর আগেও আমি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই উপদেশ তোমাকে শুনিয়েছিলাম। এই জন্য, তুমি এইসবে মন দাও।
৫০. ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ,এবার আমি পিতাজীকে দেখতে চাই। তাঁকে দেখেছিলাম এরকম অনেক দিন হয়ে গেছে । তোমার আজ্ঞা হলে আমি তাঁকে দর্শন করতে দ্বারকা যেতে চাই।

এখান থেকে কি বুঝলেন? বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ একটা কথাও ভোলেননি।
মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্বের এই ষোলো থেকে একান্ন তম অধ্যায় অনুগীতা নামেও পরিচিত। আর অশ্বমেধিক পর্বের ষোলো থেকে বিরানব্বই তম অধ্যায় অনুগীতা-পর্ব নামে পরিচিত। এখানে অর্জুন প্রথমে গীতার জ্ঞান ভুলে যাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কে অনুরোধ করেন পুনরায় সেই কথাগুলো বলতে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাকে কিঞ্চিত তিরস্কার করেন এবং অনুগীতার মাধ্যমে পুনরায় ব্রহ্মবিদ্যারই শিক্ষা দেন। তারপরে BORI CE 1824(143) এ ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠির কে বলছেন যে, কৃষ্ণ এই ধরিত্রী, আকাশ আর স্বর্গের রচয়িতা।

সবশেষে এটাই বলা যায় কৃষ্ণ একইসাথে সর্ব গুণের অধিকারী, সকল গুণ কৃষ্ণ থেকেই সৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ একইসাথে যোগী, যোগপুরুষ, যোগেশ্বর ও পরমেশ্বর!

||🚩শ্রীসচ্চিদানন্দার্পণমস্তু🚩||

হিন্দু শাস্ত্রের আলোকে নারীদের ধন–সম্পত্তিতে অধিকার

অর্ক বিশ্বাস
গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি
সত্যের সন্ধানে সনাতন



সনাতন ধর্মের শাস্ত্রে কি নারীদের ধন-সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে—এই প্রশ্নটি সমাজে আধুনিক সময়ে এসে নানা বিতর্ক ও ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই মনে করেন, হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র নারীদের সম্পদের অধিকার স্বীকার করেনি বা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে রেখেছে। অথচ, শাস্ত্রের প্রকৃত বক্তব্য ও প্রেক্ষাপট না জেনে এই ধারণাটি প্রচারিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো সেই প্রচলিত ধারণার যথার্থতা যাচাই করা এবং শাস্ত্রের আসল বক্তব্য তুলে ধরা। এজন্য আমরা আশ্রয় নেব সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রাচীন ও প্রভাবশালী আইন ও স্মৃতি শাস্ত্র—মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। মানবসমাজের নীতি-নৈতিকতা, পারিবারিক বিধান ও উত্তরাধিকার আইন নিয়ে মনুস্মৃতি যে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, তার আলোকে আমরা বিশ্লেষণ করব নারীর সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার আসলে কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

প্রথমেই নারীদের দুই ভাগে ভাগ করা যাক — অবিবাহিত নারী এবং বিবাহিত নারী। প্রথমে, অবিবাহিত নারীদের ধন-সম্পদের অধিকার ও উত্তরাধিকারের শাস্ত্রীয় বিধানগুলি বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

মনুর বচন অনুযায়ী, পিতা এবং মাতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা মিলিত হয়ে মাতা-পিতার সম্পদ ভাগ করে নেবে। অর্থাৎ মাতা অথবা পিতা মারা যাওয়ার পর প্রথমে পুত্ররাই তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়।

ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতেরঃ সমম্।
ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্‌থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ॥

সরলার্থ:- পিতা এবং মাতার মৃত্যুর পর ভাই-এরা সমবেত হয়ে পিতার এবং মাতার ধন বিভাগ করে নেবে, কারণ তাঁরা জীবিত থাকতে পুত্রদের কোনো স্বামিত্ব বা অধিকার নাই॥

(মনুস্মৃতি-৯/১০৪)

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাজন হয়ে গেলে যদি পরিবারে কন্যা (অবিবাহিত নারী বোঝাতেই কন্যা পদ প্রযুক্ত হয়) থাকে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক পুত্রকেই নিজ নিজ সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ পৃথক করে সেটা তাদের ভগিনীগণকে দান করবে।

স্বেভ্যোহংংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতেরঃ পৃথক্।
স্বাৎ স্বাদংশাচ্চেতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ॥

সরলার্থ:- ভ্রাতারা স্বজাতীয় অবিবাহিত ভগিনীগণকে নিজ নিজ অংশ থেকে চতুর্থ ভাগ ধন পৃথক করে দান করবে; যদি তারা দিতে অনিচ্ছুক হয় তা হলে পতিত হবে।

(মনুস্মৃতি-৯/১১৮)

অপর দিকে মাতার সকল স্ত্রীধন মৃত্যুর পর অবিবাহিত কন্যাই প্রাপ্ত হয়। এই ধনে পুত্রের অধিকার নেই।

মাতুস্তু যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।। (শ্লোকাংশ)

সরলার্থ:- মাতার যা স্ত্রীধন থাকবে, তা কুমারী কন্যাই পাবে॥

(মনুস্মৃতি-৯/১৩১)

এরপর দেখা যাক, যেসব ব্যক্তির কোনো পুত্রসন্তান নেই কিন্তু কন্যা সন্তান আছে তাদের মৃত্যুর পর ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার কীভাবে নির্ধারিত হবে। যদি কোনো ব্যক্তির পুত্রসন্তান না থাকে এবং কেবল কন্যাসন্তান থাকে, সেক্ষেত্রে মনুর বিধান অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি তার কন্যাকে পুত্রিকারূপে স্থির করবে এবং এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ধন-সম্পদ তার দৌহিত্র অর্থাৎ কন্যার সন্তান প্রাপ্ত হবে। কন্যাকে পুত্রিকারূপে স্থির করার অর্থ, পিতার মৃত্যু হলে দৌহিত্রকে মাতামহের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে হবে।

অপুত্রোঽনেন বিধিনা সুতাং কুর্বীত পুত্রিকাম্।
যদপত্যং ভবেদস্যাং তন্মম স্যাৎ স্বধাকরম্॥

সরলার্থ:- যে লোকের কোন পুত্র সন্তান নেই সে এই বক্ষ্যমাণ নিয়মে নিজের কন্যাকে 'পুত্রিকা' রূপে স্থির করবে। কন্যাকে পাত্রস্থ করবার সময়ে ঐ কন্যার পিতা জামাতার সাথে বন্দোবস্ত করে এই কথা তাকে বলবে—"এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে সে আমার পিণ্ড দানকারী হবে"।
(মনুস্মৃতি-৯/১২৭)

দৌহিত্রো হ্যখিলং রিক্থমপুত্রস্য পিতুর্হরেৎ।
স এব দদ্যাদ্দ্বৌ পিণ্ডৌ পিত্রে মাতামহায় চ॥

সরলার্থ:- অপুত্র মাতামহের সমস্ত ধনসম্পত্তি পুত্রিকা-পুত্ররূপ দৌহিত্র পাবে এবং উক্ত পুত্রিকাপুত্র নিজ পিতা ও মাতামহের উদ্দেশ্যে দুটি পিণ্ড দান করবে॥
(মনুস্মৃতি-৯/১৩২)
পুত্রিকার পুত্র না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজেই তার পিতার ধনভাগী হবেন। কারণ পুত্রিকা পুত্রেরই সমান। তাই পুত্রিকা স্বয়ং পুত্রস্থানাপন্ন হয়ে থাকায় অন্য কেউ তার পিতার সম্পদের অধিকারী হতে পারে না।

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ॥

সরলার্থ:- নিজেও যেমন পুত্রও সেইরকম অর্থাৎ আত্মা ও পুত্রতে প্রভেদ নেই; আবার দুহিতা অর্থাৎ 'পুত্রিকা' পুত্রেরই সমান। সেই পুত্রিকা-পুত্র (পুত্রিকা রূপ পুত্র অর্থাৎ সেই কন্যা) স্বয়ং বিদ্যমান থাকতে অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ পুত্রিকা-পিতার ধন কেমন ভাবে গ্রহণ করবে?
(মনুস্মৃতি-৯/১৩০)
আবার পুত্রিকা সম্পাদন করার পর যদি কোনো ব্যক্তির পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি পুত্রিকা ও পুত্র উভয়ের মধ্যে সমানভাগে বিভাজিত হবে।

পুত্রিকায়াং কৃতায়াস্তু যদি পুত্রোঽনুজায়তে।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ॥

সরলার্থ:- পুত্রিকা সম্পাদন করার পর যদি কোনও ব্যক্তির পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহলে পুত্র ও পুত্রিকা উভয়ের মধ্যে সমান-সমান ভাবে ধনবিভাগ হবে। কারণ, স্ত্রীলোকের জ্যেষ্ঠতা নেই অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র যে 'উদ্ধার' পেত তা সেই পুত্রিকা পাবে না॥ (একাধিক পুত্র সন্তানের মধ্যে সম্পদ বিভাজন হলে জ্যেষ্ঠতাক্রমে প্রত্যেকে কিছু অতিরিক্ত সম্পদের অংশ পেত কিন্তু এ নিয়ম স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।)
(মনুস্মৃতি-৯/১৩৪)
এবার আসা যাক সাধারণ বিবাহিত নারীদের ধন-সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে। কন্যা বিবাহ হওয়ার সময় এবং বিবাহ হওয়ার পর কন্যাকে ধন-সম্পদ দান করার নির্দেশ মনু দিয়েছেন। মনুর মতে, স্ত্রীদের ছয় প্রকার ধন। অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত।

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্মণি।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্-বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥

সরলার্থ:- 'স্ত্রীধন' ছয় প্রকার :- অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত। অধ্যগ্নি স্ত্রীধন হলো বিবাহকালে পিতাপ্রভৃতিদের দ্বারা দত্ত ধন, অধ্যাবাহনিক ধন হলো পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে নিয়ে আসার সময় যে ধন লব্ধ হয়, প্রীতিদত্ত ধন হলো রতিকালে বা অন্যসময়ে পতি কর্তৃক প্রীতিপূর্বক যে ধন স্ত্রীকে প্রদত্ত হয়।
(মনুস্মৃতি-৯/১৯৪)
এছাড়া বিবাহের পর পিতা, মাতা, স্বামী, পিতৃ-কুল এবং ভর্তৃকুল থেকে ধন প্রাপ্তির বিষয়েও মনু উল্লেখ করেছেন

যাকে অন্বাধেয় ধন বলা হয়।

অন্বাধেয়ঞ্চ যদ্দত্তং পত্যা প্রীতেন চৈব যৎ॥ (শ্লোকাংশ)

সরলার্থ:- বিবাহের পর পিতা, মাতা, স্বামী, পিতৃ-কুল এবং ভর্তৃকুল থেকে লব্ধ যে ধন তাকে সাধারণ-ভাবে 'অন্বাধেয়' বলা হয়।

(মনুস্মৃতি-৯/১৯৫)

আধুনিক সমাজে যৌতুককে একধরনের ঘৃণ্য প্রথা হিসেবে দেখা হয়, যেখানে বরপক্ষ জোরপূর্বক কন্যাপক্ষ থেকে নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য ধন-সম্পদ দাবি করে থাকে। মনুস্মৃতির বিবাহ এবং বিবাহোত্তর পিতৃকুল থেকে স্ত্রীর জন্য ধন-সম্পদ প্রাপ্তির বিধান পড়ে মনে হতে পারে যে মনু এই পরিচিত যৌতুক প্রথাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ মনু স্পষ্ট করেছেন, স্ত্রীধনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার কেবলমাত্র স্ত্রীরই থাকে। যদি স্ত্রীর নিজস্ব ধন তার পিতা, ভ্রাতা, এমনকি পতি দ্বারা অবৈধভাবে গ্রহণ বা ব্যবহার হয়, তবে তারা পাপাচারী হিসেবে গণ্য হবেন এবং অধোগতি লাভ করবেন।

স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।

নারীযানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্॥



সরলার্থ:- কন্যার পিতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন মোহবশতঃ (বা অজ্ঞতাবশতঃ অর্থাৎ কন্যার অনিচ্ছায়) স্ত্রীধন, স্ত্রীযান এবং স্ত্রীলোকের বস্ত্রাদি উপভোগ করে, সেই পাপাচরণকারী আত্মীয়গণ (শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাজ করে বলে) অধোগতি লাভ করে।

(মনুস্মৃতি-৩/৫২)

বিবাহকালে পিতা কন্যাকে যে ধন দান করেন তা কন্যারই জন্য সম্মানস্বরূপ পুরস্কার এবং প্রীতির নিমিত্ত।

অর্হণং তৎ কুমারীণামানৃশংস্যঞ্চ কেবলম্॥ (শ্লোকাংশ)

সরলার্থ:- কন্যাকে প্রদত্ত সেই ধন কন্যাদের সম্মানস্বরূপ পুরস্কার বা তাদের প্রতি কেবল প্রীতিনিমিত্ত অনুকম্পারই সূচক।

(মনুস্মৃতি-৩/৫৪)

কন্যার পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়ের জন্যই মনুর নির্দেশ স্পষ্ট— পিতা তার বিবাহিত কন্যাকে, এবং পতি তার

স্ত্রীকে ভোজন, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সযত্নে সম্মান করুক। মনুর মতে, যেখানে স্ত্রীলোকেরা এই ধরনের সম্মান ও সজ্জায় ভূষিত হন, সেসব স্থানে দেবতারা বিশেষভাবে প্রসন্ন থাকেন এবং সেই স্থান ও পরিবারের উন্নতি অব্যাহত থাকে।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

সরলার্থ:- বিবাহসময়ে বরই কেবল কন্যাকে ধন দেবেন এমন নয়। বিবাহোত্তর কালেও পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর এরা সকলেই যদি অতুল কল্যাণরাশির অভিলাষী হয়, তাহলে ঐ কন্যাদের ভোজনাদির দ্বারা পূজা করবে ও বস্ত্র-অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করবে। যে বংশে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা পূজা বা সমাদর প্রাপ্ত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন (আর প্রসন্ন হয়ে তাঁরা পরিবারের সকলকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন), আর যে বংশে স্ত্রীলোকদের সমাদর নেই, সেখানে (যাগ, হোম, দেবতার আরাধনা প্রভৃতি) সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়ে যায়।
(মনুস্মৃতি-৩/৫৫-৫৬)



মনুর নির্দেশ অনুযায়ী, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবের আগমনের সময় স্ত্রীদের অলঙ্কার, বস্ত্রাদি ও অন্যান্য সম্মানসূচক সামগ্রী দিয়ে সজ্জিত করা উচিত।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥

সরলার্থ:- অতএব যারা ভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য বা সম্পদ কামনা করে, এইরকম পতিসম্বন্ধীয় লোকেরা (উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি) বিভিন্ন সৎকার্যের অনুষ্ঠানে এবং নানা উৎসবে অলঙ্কার, বস্ত্র ও ভোজনাদির দ্বারা নিত্য স্ত্রী-লোকদের পূজা বিধান করবে।
(মনুস্মৃতি-৩/৫৯)

সুতরাং, যে ধারণা সমাজে প্রচলিত রয়েছে—হিন্দু ধর্ম নারীদের ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে—তা মনুস্মৃতির বিধানের আলোকে সম্পূর্ণ ভুল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে প্রমাণিত হয়। শাস্ত্রমূলক অর্থে নারীর সম্পদের অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকৃত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। নারীদের জন্য নির্ধারিত বিধানগুলোই প্রমাণ করে যে, সনাতন ধর্ম কেবল তাদের মর্যাদা রক্ষা করেনি, বরং তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। অতএব, শাস্ত্রের সঠিক জ্ঞান ছাড়া সামাজিক কুসংস্কার ও ভুল ধারণা ছড়ানো, কোনো যৌক্তিকতা রাখে না। আমাদের উচিত সঠিক বোধ ও প্রাচীন শাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া।



বিধবা বিবাহ

(বর্তমান) বিদ্যাসাগর বিরোধীদের ভিত্তির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়

উচ্ছ্বাস তালুকদার

বিদ্যাসাগরের সময় থেকেই বিধবা বিবাহ নিয়ে দুটো পক্ষ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দুই পক্ষেই অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ পূর্বেও যেমন ছিলেন, এই বিষয়ে তর্ক বিতর্কের ক্ষেত্রে এখনো সেরকমই দুই পক্ষেই সমান পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ আছেন বলে আমার মনে হয়। ভারতবর্ষের তখনকার সমাজে কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ধর্মগ্রন্থই ছিল ভিত্তি। বর্তমানে অবশ্য ধর্মগ্রন্থগুলোকে অনেকেই ভিত্তি হিসেবে মান্য করেন না, সবাই নিজের মনমতো নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠা করতে চান। অবশ্য এটাকে এই যুগের মানুষ আশীর্বাদ মনে করলেও, মনমতো বা অধিকাংশ লোকের ঠিক মনে হওয়া এইসব নিয়ম নীতি আমার দৃষ্টিতে ক্ষতিকরই বটে। কারণ দেখুন, আপনাদের কাছে যেটা ঠিক মনে হচ্ছে সেটা অন্তত একজনের কাছে হলেও ভুল মনে হতেই পারে। এতে করে নিয়ম কানুন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, বিভেদ তৈরি হচ্ছে। যাই হোক, মূল বিষয়ে আসি - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন সেটা আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু বিধবা বিবাহের বিপক্ষেও বড় বড় পণ্ডিতবর্গ ছিলেন। বর্তমানেও বিধবা বিবাহ নিয়ে পূর্বের ধারাবাহিকতায় তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকে। যারা বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেন তাদের অধিকাংশের মূল ভিত্তি হচ্ছে স্মৃতিশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে থাকা কতকগুলো শ্লোক। এবার স্মৃতিশাস্ত্রের সেসব শ্লোক ও বিদ্যাসাগরের মতের সমন্বয় করার ক্ষুদ্র চেষ্টা করা যাক।

হিন্দু শাস্ত্রগুলোর প্রধান দুটো ভাগ আছে, স্মৃতি ও শ্রুতি। স্মৃতিশাস্ত্রগুলোকে সংহিতাও বলা হয়ে থাকে। স্মৃতি ও শ্রুতির বিরোধ হলে শ্রুতি মান্য হয়। স্মৃতি শাস্ত্রগুলোর মধ্যে বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে মনুস্মৃতি। মনু সংহিতায় আছে -

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্। এ্যষ্টবর্ষোংষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ।।

অনুবাদ: ত্রিশবৎসর-বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, চতুর্বিংশতিবর্ষবয়স্ক ব্যক্তি অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে, ইহা দ্বারা বিবাহযোগ্যকাল প্রদর্শিত হইল- মাত্র। তিনগুণবয়স্ক পুরুষ একগুণের অধিক বয়স্কা

কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইহার ন্যূনাধিকে বিবাহ করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। (মনু সংহিতা - ৯/২৪)
এটাই যে চূড়ান্ত বয়স এমন আমি মনে করি না। তার কারণ স্মৃতি শাস্ত্রের ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত বলে একটি প্রচলিত কথা আছে। পরাশর স্মৃতি (পরাশর স্মৃতি - ১/২৩) অনুযায়ী - "সত্যযুগে মনু-ব্যবস্থাপিত ধর্ম, ত্রেতাযুগে গৌতম-ব্যবস্থাপিত ধর্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খ-লিখিত-ব্যবস্থাপিত ধর্ম, কলিযুগে পরাশরনিরূপিত ধর্ম।" মনুস্মৃতি ও পরাশর স্মৃতিতে রয়েছে -

অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।। ৮৫।।

অনুবাদ: কালভেদে পদার্থের স্বভাবভেদ হয়, তাই সত্যযুগে মানুষের ধর্ম (ধর্ম শব্দের অর্থ শুধু যাগাদি নয়, 'ধর্ম' বলতে পদার্থ মাত্রের গুণকেও বোঝায়) এক প্রকার, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ধর্ম আর এক রকম, আবার কলিযুগে ধর্ম অন্যরকম। যুগে যুগে শক্তির হ্রাস ঘটে, আর সেই অনুসারে ধর্মেরও বিভিন্নতা দেখা যায়।
(মনু - ১/৮৫, পরাশর - ১/২১)
অতএব, সবকিছু সমন্বয় করলে নানা মুনির নানা মত দ্বারা বুঝাচ্ছে সময়ের সাথে ধর্মের নিয়ম পালনের পরিবর্তন হতেই পারে, আমার মতে অঞ্চলভেদেও ধর্মের নিয়মগুলোর পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। অঞ্চল ও সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েই সমাজব্যবস্থা তৈরি হয় আর ইতিহাসের হিসেবে সেই সমাজব্যবস্থার নির্দিষ্ট নিয়মগুলোই ধর্মীয় নিয়ম কানুন বলে প্রচলিত হয়েছে। তবে এখানে একটা বিষয় জানা উচিত শ্রুতি শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রুতি অপরিবর্তনীয় এবং স্মৃতিগুলো শ্রুতির বিরোধ না হলেই মান্য আর এমনটা মনু সংহিতাও বলছে। ইতিহাস বিচারে বেদ লিখিত হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার সময় অর্থাৎ সাধারণ গবেষণা অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় ৫০০০ থেকে ৫৫০০ হাজার বছরের মধ্যে (মতান্তরে, সিন্ধু সভ্যতা ৮-১০ হাজার বছর পুরাতন)। তবে লক্ষণীয় বিষয় বেদকে শ্রুতি বলা হয় অর্থাৎ যা শুনে শুনে মনে রাখা হয়। তাহলে লিখিত আকারের পূর্বেও বেদ ছিল অন্যথা শ্রুতি বলার সার্থকতা থাকে না। বেদ নিয়ে অনেক তর্ক হয়, অনেক প্রাচীন সনাতন ধর্ম প্রচারকদের মত অনুযায়ী বেদ মানে হচ্ছে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ, ব্রাহ্মণের দুটো ভাগ আরণ্যক ও উপনিষদ। কিন্তু অল্প সংখ্যক কিছু লোকজন আবার শুধু মন্ত্র ভাগকেই বেদ মান্য করেন ও বাকিগুলোকে ইতিহাস গ্রন্থ মনে করেন। তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদকেই বেদ মান্য করেন, একই সাথে বৈদিক সাহিত্য ও ইতিহাস হিসেবেও মনে করেন। সে যাই হোক, এটা আমার এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিশাস্ত্রগুলো আনুমানিক দেড় দুই হাজার বছরের পুরাতন। উপরে পরাশর সংহিতা অনুযায়ী উল্লেখিত স্মৃতিশাস্ত্র ছাড়াও আরো অনেক স্মৃতি শাস্ত্র রয়েছে, যেগুলোর কিছু কিছু নিয়ম কানুন অন্যগুলোর থেকে ভিন্ন দেখা যায়। মূলত কোন এক অঞ্চলে কোন এক সময় উপযুক্ত নিয়ম প্রণয়ন বা সাধারণের নিয়মের পরিবর্তনের কারণেই এমন দেখা যায়। তাই সব নারীদের প্রাচীনকাল থেকে উপরের বিধান অনুযায়ী এত অল্প বয়সেই বিয়ে দেওয়া হতো এই বিষয়ে আমি সহমত নই।

পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী ৯০% ক্ষেত্রে পুরুষই অধিকাংশ বাহিরের কর্ম করতো সেই সাথে বেদাদি অধ্যয়ন, গুরু গৃহে গমন ইত্যাদি কর্মেও পুরুষদেরই বেশি দেখা যেতো। আর নারীরা গৃহের কর্ম করতো তাই সেই বিষয়ক জ্ঞান পরিবার থেকেই শিক্ষা লাভ করতো। একারণেই ছোট থেকেই মেয়েদের গৃহের কর্ম শিখতে হতো। ক্রমে এক অঞ্চলের মেয়েকে অন্য অঞ্চলে বিয়ে দেয়ার প্রচলন শুরু হয় এবং সেখানে দেশাচার ও কুলাচারের ভিন্নতা দেখা দেয়। সেকারণে বাল্য অবস্থা থেকেই পতিগৃহের দেশাচার, কুলাচার শেখানোর জন্য অধিকাংশ মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রচলন ছিল। তাই বলে এমন নয় যে, কোনো নারীর শিক্ষা দীক্ষা হতো না। মূলত বিষয়টা হচ্ছে সাধারণ নারী, স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করাতেই এবং পুরুষ। স্ত্রী-সন্তান-সম্পত্তির মতো ভোগ বিলাসকেই পছন্দ করে আসছে। বিদ্যাসাগরের সময় ও তার পূর্বেও বাল্যবিবাহ স্বাভাবিক সমাজব্যবস্থা ছিল। তিনি নিজেই ১৪ বছর বয়সে, ৮ বছর বয়সের মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। তাছাড়া ইতিহাস ঘাঁটলে অহরহ অল্প বয়সেই ছেলে মেয়েদের বিয়ের উদাহরণ পাবেন। তখনকার সমাজব্যবস্থায় নারীর কাছে তার স্বামীই সবকিছু ছিল। শরৎচন্দ্রের লেখায় পাওয়া যায় -
"ভাই বল আর বাপ-মা'ই বল, মেয়েমানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই-বাপ-মা গেলে দুঃখকষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্বস্ব যায়।" (বিরাজ বৌ, পৃষ্ঠা ১১)
বর্তমানে নারীরা স্বনির্ভরশীল হয়েছে কিন্তু পূর্বে সেরকম ছিল না। পূর্বে অধিকাংশ মেয়ে স্বনির্ভরশীল না হতে

পারার অন্যতম কারণ বিদেশী শক্তির আক্রমণ, স্বামীর প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ। যেসব নারীরা নিজের পতির প্রতি বেশি অনুরক্ত থাকতো তারা সহমরণে যেতো। ক্রমে বিদেশী শক্তির আক্রমণে একটি নিয়ম প্রচলিত হয় - কেউ একটি রাজ্য জয় করলে সেই রাজ্যের নারীরাও ওই বিজেতার ভোগের বস্তুর ন্যায় গণ্য হবে। তখন রাজস্থানের মতো অঞ্চলগুলোতে জওহর অনুষ্ঠিত হতো, এটার মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষ যেন নারীদের সম্মানহানি করতে না পারে সেকারণে অগ্নি প্রজ্বলন করে সেই অগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়া হত। ধীরে ধীরে এই প্রথাগুলো বিকৃত করে আবার কিছুক্ষেত্রে ইংরেজদের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষার জন্য জোর করে বিধবা মেয়েকে পুড়িয়ে মারা হতো যাকে 'সতীদাহ প্রথা বলা হয়। রাজা রামমোহন রায় সেটা বন্ধ করেন। তবে বিধবা মেয়েদের কষ্টের শেষ ছিল না। সেজন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন সম্ভব নয়। 'ভগবতী দেবী' নামক একটি বইয়ে পাওয়া যায় -



' শাস্ত্রানুসারে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করা বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য হইলেও প্রথমতঃ তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণসংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরে একদিন রজনী যোগে একখানি পুঁথি পাঠ করিতে করিতে তিনি হঠাৎ আনন্দবেগে উঠিয়া বলিলেন,- "পাইয়াছি, পাইয়াছি।" উপস্থিত সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পাইয়াছেন? তখন তিনি পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন:-

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধিয়তে।।"

এটি পরাশর স্মৃতির চতুর্থ অধ্যায় ২৬ নং শ্লোক। এই শ্লোকের সাধারণ অনুবাদ হচ্ছে - 'স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।' কিন্তু এই অর্থ অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গ গ্রহণ করেন নি। তাদের মতে কোনো ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ের বিষয়ে কথা দেওয়া হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে যদি উপরের কার্যগুলো হয় তবেই বিধবা মেয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। কারণ কথা দেওয়া হলে পতি পত্নী স্থির হয়ে যায়; একে বাগদান বলে। এমনকি অনেকে এও বলেন যে, বাগদান হয়ে গেলে এবং উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো ঘটলে যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে। 'ভগবতী দেবী' নামক গ্রন্থে উল্লেখিত স্থানে আরও রয়েছে - 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তঃকরণ স্বতঃই হিন্দু বালবিধবাদিগের দুঃখে বিগলিত হইত। কোন বালিকা বিধবা হইয়াছে শ্রবণ করিলে, বিদ্যাসাগর হৃদয়ের আবেগ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেন না, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন।'

বাল্ বা বালিকা দ্বারা মূলত রজঃস্বলা শুরু হয় নি এমন বয়সের মেয়েদের বুঝানো হয়। জন্মের পর থেকে রজঃস্বলা শুরু হওয়ার পূর্বের বয়স পর্যন্ত সময়কালকে বাল্য অবস্থা বলা হয় (সাধারণত ৮ থেকে ১২ বছর)। রজঃস্বলা শুরু হলে বা ঋতুমতী হয়ে গেলে সেই মেয়েকে কিশোরী বলা যায়, তারপর ১৬/১৮ বছর অতিক্রম করলে যুবা বয়স বলা হয়, এভাবেই পর্যায়ক্রমে বয়সের সীমার নামকরণ করা হয়েছে। বিরোধ মূলত এই বয়সের হিসেব না বুঝার জন্যেই হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর বিরোধীদের অন্যতম ভিত্তি 'মনু স্মৃতিতে আছে -

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুর্নভূত্বা স পৌর্নভব উচ্যতে॥
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদগতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌর্নভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

অনুবাদ: পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা যে স্ত্রী, (নিজ ইচ্ছায়) সংস্কার দ্বারা পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া উহা

দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব পুত্র হইবে। ঐ স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি অর্থাৎ পুরুষসম্পর্কে দুষিতা না হইয়া থাকে, তবে উহার পুনর্ব্বার বিবাহ-সংস্কার হইতে পারে এবং যে স্ত্রী বালকস্বামী দেখিয়া বিরাগে অন্য পুরুষকে কতক দিন আশ্রয় করিয়া পুনরায় যদি পূর্ব্ব-পতির নিকট আইসে, তবে ভর্তা পুনরায় বিবাহ-সংস্কার করিয়া লইবে, উহা পুনর্ভু'রূপ পত্নী হইবে। (মনু স্মৃতি - ৯/১৭৫-১৭৬)

এখানে অক্ষত যোনির পুনরায় বিবাহ সংস্কার স্বীকৃত হয়েছে। তবে বর্তমানে অনেকেই বলেন বিধবা বিবাহ মানেই সেই স্ত্রী পুনর্ভু'রূপ ও তার সন্তান পৌনর্ভব। স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী পৌনর্ভব সন্তান ধনাধিকার সহ আরো কিছু অধিকার থেকে বঞ্চিত। উপরে প্রথমে বলা হয়েছে কোনো বিধবা বা পরিত্যক্তা (পরিত্যক্তা স্ত্রী বিষয়েও বিধান আছে তবে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়) স্ত্রী নিজ ইচ্ছায় অন্য পুরুষের স্ত্রী হয় তাহলে তার সন্তান পৌনর্ভব হবে অর্থাৎ সেই স্ত্রী পুনর্ভু'রূপ হবে। কিন্তু তার পরেই সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে অক্ষতযোনির ক্ষেত্রে পুনরায় বিবাহ সংস্কার হতে পারে। শুধু কারোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলেই সেই স্ত্রীকে পুনর্ভু'রূপ বলা হবে। অক্ষতযোনি বলতে বুঝায় পুরুষ দ্বারা দূষিত হয় নি অর্থাৎ শারীরিক সম্পর্ক হয় নি এমন নারী পুরুষ। সনাতন শাস্ত্রে কাম, সন্তান উৎপাদনের জন্যেই বৈধ। বিদ্যাসাগর যে বিধবাদের জন্য মূলত বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন তারা যে বাল বিধবা সেটা উপরেই দেখিয়েছি তাছাড়া স্মৃতি বিধান অনুযায়ী ঋতুমতী হওয়ার পূর্বেই বিয়ে দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু বিবাহ মানেই শারীরিক সম্পর্ক নয় অন্তত সনাতন শাস্ত্র অনুযায়ী। সেগুলোরও বিধি নিষেধ আছে। বিদ্যাসাগর ১৪ বছর বয়সে বিয়ে করলেও সন্তান জন্ম হয় বিয়ের প্রায় ১৬ বছর পর (অর্থাৎ ৩০ বছর বয়স)। বিদ্যাসাগর যাদের নিয়ে কাজ করেছিলেন তারা মূলত অক্ষত যোনি তথা বালিকা ছিল। বালিকাদের যেহেতু ঋতুমতী হওয়ার পূর্বেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো সেকারণে শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার তথা ক্ষত যোনি হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। পরবর্তীতে সব বিধবার জন্যেই বিধবা বিবাহ প্রচলন হলেও বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু বাল বিধবা নিয়েই ছিল।

লেখাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সম্মান প্রদর্শনার্থে লিখিত হয়!

তথ্যসূত্র:

১) মনু স্মৃতি - মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়
২) মনু স্মৃতি - ভারতচন্দ্র শিরোমণি অনুবাদ
৩) পরাশর স্মৃতি - পঞ্চানন তর্করত্ন (ঊনবিংশতি সংহিতা)
৪) বিরাজ বৌ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৫) বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী - শ্রী প্রিয়দর্শন হালদার
৬) বিভিন্ন অন্তর্জাল সূত্র



ঈশ্বরের অস্তিত্ব

শ্রীঅপূর্ব মোদক চৌধুরী

ঈশ্বর,এমন একটি শব্দ যা আজ সনাতনীগণ শুনলে এর সংজ্ঞা স্বরূপ আব্রাহামিকদের স্রষ্টার মতো ধারণা পোষণ করেন। ফলে নব্য, নাস্তিক যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করে তখন কোনো উত্তর দিতে পারেন না।তাই আমি কীভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি, ঈশ্বরকে কীভাবে দেখি সেই বিষয়ে বলব এবং তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করব।
ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানার আগে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে বহু জন বহু ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, তাই আগে আমি ঈশ্বরের স্বরূপ অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করব তারপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোঝানোর চেষ্টা করব।
১) অদ্বৈতবাদের অনুযায়ী দৃষ্টিকোণ: আচার্য্য শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী বলেন যে ঈশ্বর হলেন অজ্ঞান সমষ্টি চৈতন্য। সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্যই সর্বেশ্বরত্ব,সর্বজ্ঞত্ব, জগতের কারণ ঈশ্বর বলে অভিহিত হন (বেদান্তসারঃ ৩৭-৩৮)। একই চৈতন্যই জীবের ক্ষেত্রে হচ্ছেন ব্যষ্টি চৈতন্য এবং ঈশ্বরের ক্ষেত্রে হচ্ছেন সমষ্টি চৈতন্য (বেদান্তসারঃ ৪১)। এখন এই অজ্ঞান উপাধিরহিত চৈতন্যের স্বরূপ কি? ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপ বলতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলেন,
"সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণমুচ্যতে" - ব্রহ্মবিদগণ্ সত্য, জ্ঞান ও অনন্তকে ব্রহ্মের লক্ষণ বলেছেন (তত্ত্বোপদেশঃ ১৮) আর আচার্য্য শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতীও বলেছেন, "বস্তু - সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম" - সৎ চিৎ ও আনন্দময় অদ্বয় বস্তুই ব্রহ্ম (বেদান্তসারঃ ৩৩)। যাহা তিনকালে একরূপ থাকে, কোনোরূপ পরিবর্তিত হয় না তাই সৎ। 'ঘট

আছে' , 'পট আছে' ইত্যাদি স্থলে যে আছে সেটা সদবস্তুর পরিচায়ক। সুতরাং যাবতীয় জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে 'সৎ' বা 'অস্তি' বলে বোধ হয়,অস্তিবোধের উপাধি সেই যাবদ্ বিষয়কে ত্যাগ করলে যে নিরুপাধিক অস্তিত্বরূপ বস্তুটি থাকে তাই সত্য যা দৃশ্য হয় না। সদবস্তু জ্ঞানের বিষয় নয় বরং নিজেই জ্ঞানস্বরূপ।এই জ্ঞানস্বরূপ সদবস্তুর যেহেতু অভাব নেই তাই তাহা আনন্দস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যে স্বপ্ন,জাগ্রত ও সুষুপ্তি তিন অবস্থা এবং অতীত , বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই যে এক (অভেদ) থাকে তা পঞ্চদশী ৬-৭ এ শ্রীবিদ্যারণ্য তীর্থ সুন্দর যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

২) দ্বৈতবাদ অনুযায়ী দৃষ্টিকোণ: শ্রীমধ্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন ১/১/৭ এ বলেন আত্মাই ব্রহ্ম। জীব ও আত্মা দ্বিবিধ চৈতন্য। ব্রহ্মাদি সমুদায়ই জীব আর আত্মা একমাত্র জনার্দ্দন। সেই আত্মচৈতন্য বিষ্ণুর আভাস বা প্রতিবিম্ব হচ্ছে জীব কিন্তু জীব শ্রীবিষ্ণুর অধীনে (আনন্দতীর্থ - অণুভাষ্য ২/৩/৫ ও তদীয় রাঘবেন্দ্রতীর্থকৃত তত্ত্বমঞ্জুরী টীকা)। অর্থাৎ এক পরমব্রহ্ম বিষ্ণুই সত্য, জ্ঞানময় ও অনন্ত (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম ১/১/১৫), জীব সেই সাক্ষী বিষ্ণুর প্রতিবিম্ব কিন্তু তার বশবর্ত্তী। অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে উভয় দার্শনিকগণ ব্রহ্মের চৈতন্য বা আত্মাস্তিত্ববোধ স্বরূপকেই ব্রহ্মের স্বরূপ মেনেছেন। যদি চৈতন্যের বা আমাদের অস্তিবোধক ও চৈতন্য সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব প্রদান করে তা প্রমাণ করতে পারলেই ঈশ্বরও প্রমাণিত হয়।

i) আদিগুরু শঙ্করাচার্য্যের মতে "**দ্রষ্টা দৃশ্যাৎ অন্যঃ ইতি প্রসিদ্ধঃ ন্যায়ঃ লোকে দৃশ্যতে ঘটাদিবৎ**' -(অজ্ঞানবোধিনী ৫৪) ঘটাদি হইতে যেমন ঘটদ্রষ্টা ভিন্ন তদ্রূপ দ্রষ্টা (সাক্ষী চৈতন্য) হইতে দৃশ্য (উপাধিযুক্ত দেহ) ভিন্ন। সেই দ্রষ্টার অস্তিত্ব বা আত্মাস্তিত্ববোধকে আচার্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে সুন্দর করে প্রমাণ করেছেন,"তিনিই সকলের আত্মা, অতএব ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। সকলেই আত্মার বিদ্যমানতা স্বীকার করে। কেহই 'আমি নাই' এইরূপ জ্ঞান করে না,যদি আত্মারই বিদ্যমানতা না থাকে তাহা হইলে সকলেরই আমি নাই এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে। সেই আত্মাই ব্রহ্ম।(শঙ্করভাষ্য ১/১/১)" অর্থাৎ এইরূপ বোধ দ্বারা চৈতন্য প্রমাণিত হলো।

ii) চেতনা বা চৈতন্যই যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রদান কারী তার প্রমাণে রুবার্ট স্পিরা বলেছেন, "বস্তুবাদ বলে যে পদার্থ একটি পৃথক সত্তা এবং চেতনার জন্ম হয়েছে পদার্থ থেকে। কিন্তু পদার্থ যে সত্যিই আছে, সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি চেতনার মাধ্যমেই। চেতনা ছাড়া পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করা কি সম্ভব? ধরুন, বলা হল যে আপনার সামনে একটা টেবিল রয়েছে। এবার টেবিলটা সত্যিই আছে কিনা সেটা প্রমাণ করতে গেলে সবচেয়ে আগে যেটা লাগবে, সেটা হল একটা চেতনাশীল এনটিটি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে টেবিলের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে। চেতনাহীন কোন সত্তার পক্ষে টেবিলের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আপনি বলতেই পারেন যেসব যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হবে তাদের তো কোনও চেতনা নেই, অতএব চেতনাহীন বস্তু দিয়ে পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু এটা কি ভেবে দেখেছেন যে, চেতনাহীন যন্ত্র পরিমাপ করার পরে যে ফলাফল দেবে, তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে সিদ্ধান্তে আসতে গেলে সচেতন সত্তার হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। অর্থাৎ চেতনা ছাড়া পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভবই নয়। তাহলে কোন যুক্তিতে আমরা বলব যে চেতনা ছাড়াও জগতে পদার্থ বলে আলাদা কিছু রয়েছে? আমরা শুধুমাত্র অনুমান করে নিচ্ছি যে সামনে একটা টেবিল রয়েছে। চেতনা নিরপেক্ষভাবে আমরা সেই টেবিলের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারছি না।" যারা অনুমান প্রমাণে অবিশ্বাসী তারা নিশ্চয়ই শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ ১/১/২ পড়ে দেখবেন তিনি সেখানে অনুমান প্রমাণকে বেদসম্মত বলেছেন। এছাড়াও পাতঞ্জল যোগদর্শন ১/৭ এবং শান্ডিল্য ভক্তিসূত্র ২/৯৯ দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে চৈতন্য প্রত্যক্ষ অনুভবে প্রমাণিত এবং এই চৈতন্যই সকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রদান করে। যেহেতু চৈতন্যই প্রমাণিত হয় তাহলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। এখন কেউ যদি বলে যে আমরা বদ্ধ তাহলে কি ঈশ্বরও বদ্ধ যেহেতু উভয়ই একই চৈতন্য তাহলে বলব ভক্তিবাদী শান্ডিল্যকর্তৃক ভক্তিসূত্র দ্বিতীয় আহ্নিকের ৯৩ - ৯৫ নং সূত্র পড়তে পারেন। এছাড়াও ঈশ্বর স্বপক্ষে মহামতি উদয়নাচার্য্য তাঁর কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে আটটি অনুমান দিয়েছেন যেমন:

ব্রহ্মান্ডনাশঃ প্রযত্নজন্যঃ (প্রতিজ্ঞা)

নাশত্বাৎ (হেতু)

ঘটনাশবৎ (উদাহরণ)

আবার, তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/১ এবং মহাভারত শান্তিপর্বে নারদকৃত মহাপুরুষস্তব, শান্তিপর্ব ২২৯/৪২, ২০৪/৬৬ তে ব্রহ্মকে অনন্ত (যার স্বরূপ অনন্ত), অনন্তগতে (যার অবস্থার অন্ত নেই বা যিনি অনন্তে অবস্থান করেন) বলা

হয়েছে। এখন যা অনন্ত (Infinite Space) তা কখনও ত্রিমাত্রিক জগতে দেখা সম্ভব নয়। যেমন: In mathematics, there is no limit in terms of the number of dimensions that a geometric object can have. However, it is impossible for the human mind to envisage a geometric object with, for example, 15 or more dimensions. The primary reason is that we live in a three-dimensional world, a finite-dimensional world. এছাড়াও আমরা গাণিতিক ভাবে চার মাত্রিক, ৫ মাত্রিক অনেক বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কিন্তু ত্রিমাত্রিক জগতে তা দেখা বা ঐ ধরনের কোন বস্তু তৈরি করার সম্ভাবনা নেই, তার মানে এও নয় যে নেই। ত্রিমাত্রিক জগতে কিছু সীমা রয়েছে তাই ৪, ৫, ১১ মাত্রার মাল্টিভার্স বা অসীম মাত্রা থাকলে দেখা সম্ভব নয়। তদ্রূপ অনন্ত ব্রহ্মকে ত্রিমাত্রিক জগতে দেখার চিন্তা সম্ভব নয়। কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মের মূর্ত স্বরূপে ভক্ত ভগবান দেখেন। তা এই ভাবে সম্ভব যেমন $y = f(x) = 2x+5$ একটা function যেখানে x independent variable, y dependent variable এখন x বাস্তব, অবাস্তব সকল ধরনের input দেওয়া যায় যতক্ষণ না x এর মান নির্দিষ্ট হচ্ছে যখন X এর একটা নির্দিষ্ট মান input হিসেবে দেওয়া হয় তখন উক্ত function থেকে একটা নির্দিষ্ট Output পাই। তদ্রূপ ভক্ত ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তির কারণে পরমেশ্বর উপাধি ধারণ করে মায়াময় রূপ ধারণ করে ভক্তকে দর্শন দেন। এতে ব্রহ্মের আন্তত্যাদিতে কোন আপত্তি হয় না যেহেতু ব্রহ্মের মূর্ত ও অমূর্ত উভয় রূপের কথা শ্রুতি সম্মত (রামপূর্বতাপনী উপনিষদ ১/৬)। আবার উপাসনার জন্যেও সেই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয় এতে ব্রহ্মের আন্তত্যাদিতে কোন সমস্যা হয় না (রামপূর্বতাপনী উপনিষদ ১/৭)। এর জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমন নারায়ণ দূর্বাসা মুনিকে বলছেন "অহং ভক্তপরাধীনো-হে দূর্বাসা! আমি সম্পূর্ণরূপে ভক্তের অধীন (শ্রীমদ্ভাগবতম ৯.৪.৬৩)" যেমন y, x এর অধীনে।

অর্থাৎ উপরোক্ত সকল বিষয়গুলো এক করলে বোঝা যায় যে ঈশ্বর স্বানুভব - অনুমান - আগম এই তিন প্রমাণে সিদ্ধ তাই হিন্দুদের ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। বৈদিকদের ঈশ্বর নিয়ে যে দৃষ্টিকোণ তা আব্রাহামিক দের যে স্রষ্টার চিন্তার তাঁর অনেক জটিল,দুটোকে মিলে ফেললে হবে না।

তথ্যের উৎসঃ

১) অদ্বৈতবাদ - রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
২) বেদান্তদর্শনম্ - শাঙ্করভাষ্য - শ্রীমহেশ চন্দ্র পাল কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত
৩) বেদান্তসারঃ - শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী - অনুবাদ ও টীকা স্বামী অমৃতত্বানন্দ
৪) পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ - মধ্বাচার্য্য - শ্রীমহেশ চন্দ্র পাল কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত
৫) অণুভাষ্যম্ - মধ্বাচার্য্য - শ্রীশ্রী অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষেণন সম্পাদিতম্
৬) শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী - শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকৃত সম্পাদিত
৭) পঞ্চদশী - বিদ্যারণ্য তীর্থ - শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনুবাদ
৮) ভক্তিসূত্র - গীতাপ্রেস
৯) পাতঞ্জল যোগদর্শন - গীতাপ্রেস
১০) "Sam Harris & Rupert Spira debate the primacy of consciousness" (YouTube)
১১) Writing of Eindhoven University of Technology
১২) মহাভারত - শান্তিপর্ব - হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
১৩)অর্থর্ব্বেদীয় রামপূর্বতাপনী উপনিষদ - শ্রীমহেশ চন্দ্র পাল কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত
১৪) Precalculus - Jemes Stewart
১৫) শ্রীমদ্ভাগবতম - গীতাপ্রেস

বিঃদ্রঃ এই বিশ্লেষণ আমি আমার অতি অল্প জ্ঞান দিয়ে লিখেছি তাই দার্শনিক ভাবে ভুল ত্রুটি হতে পারে যেহেতু আমি তাত্ত্বিকভাবে কোন ধর্মবিষয়ে অভিজ্ঞ নই। অতএব এই আলোচনায় কোন ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এই সমগ্র আলোচনা আমি আমার আরাধ্য শ্রীদ্বারকাধীশের পাদপদ্মে অর্পণ করলাম।

।।শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।।



প্রকৃতি পরম গুরু

অর্ক বিশ্বাস
গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি
সত্যের সন্ধানে সনাতন

মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একজন গুরু আবশ্যক। গুরুই একজনকে সঠিক পথ দেখিয়ে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে কিংবা মহাপুরুষদের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় প্রত্যেক সিদ্ধ পুরুষের জীবনে অন্তত একজন গুরুর অনস্বীকার্য ভূমিকা বিদ্যমান রয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে সকল গুরুর গুরু পরম গুরু হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর।

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥

সরলার্থ:- তিনি প্রাচীন গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নন।
(পাতঞ্জল যোগদর্শন-১/২৬)
স্বয়ং ঈশ্বরই সাধকের নিকট প্রকৃত গুরু রুপে প্রকট হয়ে সাধকের মার্গ দর্শন করেন।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সরলার্থ:- শ্রীগুরুই ব্রহ্মা, শ্রীগুরুই বিষ্ণু, শ্রীগুরুই শিব। শ্রীগুরুই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম। সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি॥
(গুরুগীতা-২৪)
আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটি বদ্ধমূল ধারণা যে কেবলমাত্র মানুষরূপেই একজন গুরু এসে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু ইতিহাস-পুরাণে এমন দৃষ্টান্তও দেখতে পাওয়া যায় যেখানে গুরু সাধকের নিকট মানুষরুপে আবির্ভূত না হয়ে দেবতারূপে আবির্ভূত হয়ে বা প্রকৃতির মাধ্যমেই সাধককে মার্গ দর্শন করিয়েছেন।

আজ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ (উল্লেখ্য ভাগবত পুরাণ মূলত দুইটি, একটি বিষ্ণুভাগবত পুরাণ, অপরটি দেবীভাগবত পুরাণ। এখানে বিষ্ণুভাগবত পুরাণ থেকে উদ্বৃত করা হয়েছে) হতে এমনি একটি উপাখ্যান তুলে ধরার চেষ্টা করব যেখানে একজন সাধক বিশ্বপ্রকৃতিকে গুরু রুপে বরণ করে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সাধনা করেছেন এবং সিদ্ধি লাভ করেছেন:-

একবার ধর্ম মর্মজ্ঞ রাজা যদু দেখলেন যে এক ত্রিকালদর্শী তরুণ অবধূত ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে বিচরণ করছেন। তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন। রাজা যদু জিজ্ঞাসা করলেন- "হে ব্রহ্মন! আপনি কর্মে লিপ্ত না থেকেই কেমন করে এই সুনিপুণ বুদ্ধি অর্জন করলেন? যার আশ্রয়ে থেকে আপনি পরম বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও বালকবৎ জগতে বিচরণ করে থাকেন! সাধারণত মানব আয়ু, যশ অথবা সৌন্দর্যের অভিলাষ নিয়েই ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা তত্ত্বজিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে; অকারণে কোথাও প্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায় না। আমি দেখছি আপনি কর্ম সম্পাদনে সমর্থ, বিদ্বান ও নিপুণ। আপনার ভাগ্য এবং সৌন্দর্য দুইই প্রশংসনীয়। আপনার বাণীতে যেন অমৃতের ক্ষরণ। তবুও আপনি জড়, উন্মত্ত অথবা পিশাচবৎ অবস্থায় থাকেন; আপনার কর্মও নেই, চাহিদাও নেই! জগতের সিংহভাগ ব্যক্তিরা কাম ও লোভের দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় যেন আপনি তার থেকে মুক্ত। বনের হাতি যেমন বন থেকে বেরিয়ে নদীর জলে দাঁড়িয়ে আছে তদনুরূপ সাংসারিক দাবানলের আঁচও আপনার কাছে পৌঁছতে পারছে না। হে ব্রহ্মন্ ! আপনি পুত্র, স্ত্রী, সম্পত্তিরূপী সংসার থেকে স্পর্শরহিত। আপনি নিজ স্বরূপেই বিরাজমান। আমার জানতে ইচ্ছা করে যে কেমনভাবে আপনি আত্মাতেই এমন অনির্বচনীয় আনন্দ পেয়ে থাকেন? অনুগ্রহ করে আমার এই জিজ্ঞাসার সমাধান করুন।"

ব্রহ্মবেত্তা অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন- "রাজন্! আমি নিজ বুদ্ধি সহযোগে বহু গুরুর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছি এবং তার ফলে জগতে মুক্তভাবে সচ্ছন্দে বিচরণ করতে সক্ষম। তোমাকে তাঁদের পরিচয় দেব ও তাঁদের - কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার কথাও বলব। আমার শিক্ষাগুরুদের নাম শোনো- পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর বা মৌমাছি, হাতি, মধু সংগ্রাহক, হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বেশ্যা, কুহর পাখি, বালক, কুমারী কন্যা, বাণ নির্মাতা, সর্প, উর্ণনাভি এবং সুপেশকৃত (কাঁচপোকা)।

রাজন্! আমি এই চতুর্বিংশতি গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁদের আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। হে বীরবর যযাতিনন্দন! আমি যাঁর কাছ থেকে যেমন শিক্ষা লাভ করেছি তা যথাযথভাবে তোমাকে বলছি, শোনো।

আমি ধরিত্রীর কাছে তার ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা গ্রহণ করেছি। কত আঘাত, কত উৎপাতই না ধরিত্রীকে সহ্য করতে হয়। এর জন্য ধরিত্রীকে কোনো প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে দেখা যায় না; ক্রন্দন চিৎকার কিছুই না করে সে সব সহ্য করে। এই জগতে প্রাণীকূল প্রারব্ধানুসারে কর্মে সচেষ্ট হয় এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে থাকে। ধীর ব্যক্তির উচিত তাদের বাধ্য-বাধকতা অনুধাবন করে কোন কিছুতেই ক্রোধ না করা এবং ধৈর্যচ্যুত না হওয়া। যথাবৎ নিজ আচরণে দৃঢ় থাকা। পৃথিবীর বৈগুণ্য পর্বত এবং বৃক্ষ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে যেমন তাদের সমস্ত মহোদ্যমই সদা সর্বদা অপরের কল্যাণে হয়ে থাকে অথবা এও বলা যায় যে তাদের জন্মই জগতের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। সাধু ব্যক্তিদের উচিত যে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তাদের কাছে পরোপকার করার শিক্ষা গ্রহণ করা।

আমি শরীরাভ্যন্তরে নিবাসকারী বায়ু-প্রাণবায়ুর কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যেমন সে ক্ষুন্নিবৃত্তির ইচ্ছা পোষণ করে এবং তার প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে যায় তেমন ভাবেই সাধকের পক্ষেও এই কাম্য যে জীবন নির্বাহ হেতু আবশ্যক ভোজনই যেন সে গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তি হেতু বহুবিধ পদার্থের কামনা অনুচিত। এক কথায় বিষয় উপভোগ যেন সেই সীমা লঙ্ঘন না করে যাতে বুদ্ধির বিকৃতি হয়, মনের চঞ্চলতা আসে আর বাণী ব্যর্থ কথোপকথনে লিপ্ত হয়।

শরীরের বাইরে অবস্থিত বায়ুর কাছে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যেমন বায়ুকে নানা স্থানে যেতে হয় কিন্তু সে কোথাও আসক্ত হয়ে পড়ে না, কারো প্রতি গুণ অথবা দোষ আপন করে নেয় না তেমনভাবেই সাধক ব্যক্তির পক্ষেও এই কাম্য যে, প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম ও স্বভাবযুক্ত পরিবেশে গমন করেও যেন সে নিজ লক্ষ্যে স্থির থাকে। সে যেন কারো গুণ অথবা দোষের সম্মুখে আত্ম-সমর্পণ না করে; কারো প্রতি আসক্তি অথবা দ্বেষে যুক্ত না হয়। গন্ধ কখনো বায়ুর গুণ নয়, তা পৃথিবীর গুণ। কিন্তু গন্ধ বহন করবার দায়িত্ব বায়ুর। গন্ধ বহন করলেও বায়ু শুদ্ধই থাকে, গন্ধের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় না। তেমনভাবেই সাধকের যতক্ষণ এই পার্থিব শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে সে ব্যাধি-পীড়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি বহন করে যায়। কিন্তু যে সাধক নিজেকে শরীর-রূপে না

দেখে আত্মারূপে দেখে থাকে - সে শরীর এবং তার গুণের আশ্রিত হলেও তার থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকে।"
অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন,"রাজন! স্থাবর জঙ্গম ব্যতিরেকে ঘটে-পটে দৃশ্য পদার্থসকলের কারণ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হলেও বস্তুত আকাশ এক, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। তেমনভাবেই বিশ্ব চরাচরে অবস্থিত শরীর সমুদায়ের মধ্যে আত্মারূপে সর্বত্র স্থিত হওয়ায় ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। সাধকের পক্ষে কাম্য হল সে যেন সুতোর মধ্যে ব্যাপ্ত তুলাবৎ আত্মাকে অখণ্ড এবং অসঙ্গরূপে প্রত্যক্ষ করে। তার বিস্তৃতি এত বিশাল যে তার তুলনা সম্ভবত আকাশের সঙ্গেই করা যেতে পারে। অতএব সাধকের আত্মার ব্যাপকতার চিন্তা আকাশরূপে করাই বিধেয়। আগুন লাগে, বৃষ্টি হয়, অন্নাদির সৃষ্টি ও বিনাশ হয়, বায়ুর দ্বারা মেঘাদি আসে, চলে যায়; এই সব ঘটনার পরেও আকাশ কিন্তু অসংলগ্ন থেকেই যায়। আকাশের দৃষ্টিতে এই সকলের অস্তিত্বই নেই। তেমনভাবেই ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চক্রে অনন্ত নামরূপ সকলের সৃষ্টি ও প্রলয় হয় কিন্তু আত্মার সঙ্গে তার কোনো সংলগ্নতাই নেই।
জল স্বভাবতই স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মধুর ও পবিত্রতা প্রদানকারী হয়ে থাকে এবং গঙ্গাদি তীর্থের দর্শন, স্পর্শন, নাম উচ্চারণেই সকলে পবিত্র হয়ে যায়। তেমনভাবেই সাধকেরও শুদ্ধ, স্নিগ্ধ, মধুরভাষী ও পবিত্রতা প্রদানকারী হওয়া কাম্য। জল থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি নিজ দর্শন, স্পর্শন ও নাম-উচ্চারণের দ্বারাই সকলকে পবিত্র করে দেন।
রাজন! অগ্নিও আমার শিক্ষাগুরু। অগ্নি স্বয়ং তেজস্বী ও জ্যোতির্ময়, অন্যের তেজের কোনো প্রভাবই তাঁর উপর পড়ে না। তার সংগ্রহ-পরিগ্রহের হেতু কোনো পাত্রও নেই, সব কিছু উদরে ধারণ করে এবং সর্ব বস্তু গ্রহণ করার পরও সে গ্রহণীয় বস্তুসকলের দোষে লিপ্ত হয় না। তেমনভাবে সাধকের পক্ষেও কাম্য যে, সে যেন পরম তেজস্বী হয়, তপস্যায় দেদীপ্যমান হয়, ইন্দ্রিয় সমুদায় থেকে অপরাভূত হয়, শুধুমাত্র উদরপূর্তির জন্য আবশ্যক অন্নের সংগ্রহকারী এবং যথাযোগ্য বিষয়ের উপভোগ কালেও নিজ মন ও ইন্দ্রিয় নিচয়কে বশকারী হয় এবং অপরের দোষের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। অগ্নি কোথাও (কাষ্ঠে) প্রকাশিত কোথাও অপ্রকাশিত। তেমনভাবে সাধকও প্রয়োজনে কোথাও গুপ্ত ও কোথাও প্রকাশিত হবে। তার এমন রূপেও প্রকাশিত হওয়া কাম্য যাতে কল্যাণকামনাকারী ব্যক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে যেন অগ্নিবৎ ভিক্ষারূপ যজ্ঞকারীর অতীত এবং ভাবী অশুভকে ভস্মসাৎ করে দেয় এবং সাধারণ লোকেরও অন্নগ্রহণকারী হয়। সাধক ব্যক্তির এমনভাবে বিচার করা কাম্য যেমন ছোট-বড় বাঁকাচোরা কাষ্ঠে অগ্নি সংযোজিত হলে বাস্তবে সেইরূপ না হলেও অগ্নি সেইরূপে দেখা যায়। তেমনভাবেই সর্বব্যাপক আত্মাও মায়ার দ্বারা নির্মিত কার্য-কারণরূপ জগতে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য সেই সকল বস্তুর নাম-রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ বিরহিত হলেও সেই রূপে অবস্থিত বোধ হয়।
চন্দ্রের কাছ থেকেও আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমরা দেখি যে কালের প্রভাবে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হতেই থাকে তবুও আমরা জানি চন্দ্র তো চন্দ্রই; তার হ্রাসও হয় না, বৃদ্ধিও হয় না। তেমনভাবেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত অবস্থা আসতে দেখা যায় সব কিন্তু শরীরেরই, আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। অগ্নিশিখার অথবা দীপশিখার উৎপত্তি ও বিনাশ ক্রমান্বয়ে চলতেই থাকে কিন্তু তা দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই ভাবেই জলপ্রবাহবৎ বেগবান কালের প্রভাবে প্রাণীকুলের শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ সমানে হতেই থাকে কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে তা দৃষ্টিগোচর হয় না।
রাজন! আমি সূর্যের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি। সূর্য নিজের আলোকরশ্মির দ্বারা পৃথিবীর জল আকর্ষণ করে এবং উপযুক্ত সময়ে তা বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করে দেয়। তেমনভাবেই যোগীপুরুষের উচিত প্রয়োজন অনুসারে যথাসময়ে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও উপযুক্ত সময়ে তা পরিত্যাগ করা। কোনো সময়েই তার ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে আসক্তি যেন না আসে। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য তার মধ্যেই প্রবিষ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু তাতে সূর্য একাধিক হয়ে যায় না। তেমনভাবেই স্থাবর-জঙ্গম উপাধিসমূহের ভেদজ্ঞানে এমন বোধ হয় যেন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যার এইরূপ বোধ তার বুদ্ধি স্থূল। বস্তুত আত্মা সূর্যবৎ একই। স্বরূপত তাতে কোনো ভেদ নেই।"
অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন- "রাজন্! কোথাও কারো প্রতি অতি স্নেহ অথবা আসক্তি থাকা উচিত নয় কারণ তার ফলে তার বুদ্ধি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে দীন হয়ে পড়বে অর্থাৎ তাকে কপোতের ন্যায় অতি ক্লেশের সম্মুখীন হতে হবে।
রাজন্! কোনো এক জঙ্গলে এক কপোতের বাস ছিল। সে একটি গাছে নিজের বাসা বেঁধেছিল ; নিজ কপোতীর সঙ্গে সে বহু দিন পর্যন্ত সেই বাসায় রইল। সেই কপোত-কপোতীর হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি স্নেহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকল। তারা গৃহস্থধর্মে এমনই আসক্ত হয়ে পড়ল যে পরস্পরের দৃষ্টি, অঙ্গ এবং ভাবনার দৃঢ় বন্ধনে লিপ্ত হয়ে গেল। পরস্পরের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে সেখানকার বৃক্ষশ্রেণীতে একত্রে শয়ন, বসন, বিচরণ, বিশ্রাম, কথোপকথন, ক্রীড়া এবং আহারাদি সম্পন্ন করত। কপোতীর উপর কপোতের প্রবল আসক্তি

ছিল যার জন্য কপোতির কামনা পূর্ণ করবার জন্য সে অতি বড় কষ্টও হাসি মুখে সহ্য করত। সেই কপোতীও নিজ কামুক পতির কামনাসকল পূর্ণ করত। যথা সময়ে কপোতী গর্ভবতী হল। সে তার পতির আশ্রয়েই নিজের বাসাতে ডিম পাড়ল। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে যথাসময়ে সেই ডিম্বগুলি প্রস্ফুটন হল এবং তার ভিতর থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত শাবকগণ নির্গত হল। শাবকদের অঙ্গ ও রোঁয়া অত্যন্ত কোমল ছিল। এবার কপোত-কপোতীর দৃষ্টি শাবকদের উপর নিবদ্ধ হল। তারা অতি প্রেম ও আনন্দ সহকারে নিজ শাবকদের লালন-পালনে অপত্য স্নেহ দান করতে লাগল এবং শাবকদের সুমিষ্ট ডাক শুনে আনন্দমগ্ন হয়ে যেতে লাগল। শাবকগণ তো সব সময়ে প্রসন্ন; তারা যখন তাদের সুকুমার পাখনা দিয়ে তাদের মা-বাবার স্পর্শ করত, কূজন করত, নিষ্পাপ আচরণে মগ্ন হত এবং লাফিয়ে মা-বাবার কাছে দৌড়ে আসত তখন কপোত-কপোতী আনন্দমগ্ন হয়ে যেত।

রাজন্! বস্তুত সেই কপোত-কপোতী ভগবানের মায়াতে মোহিত হয়ে পড়েছিল। তাদের হৃদয় আর এক স্নেহবন্ধনে যুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদের শিশু শাবকদের লালন-পালনে এতই ব্যগ্র হয়ে উঠল যে তাদের জগতে ইহলোক পরলোকের বিস্মৃতি হতে লাগল। তারা দুজনেই একদিন শিশু শাবকদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ হেতু জঙ্গলে গমন করেছিল। তাদের কুটুম্ব সংখ্যায় অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু খাদ্যের অভাব হয়েছিল। তাই খাদ্য আহরণে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জঙ্গলে চতুর্দিকে বিচরণ করে বেড়াতে থাকল। এদিকে এক ব্যাধ বিচরণ করতে করতে ভাগ্যের নির্দেশেই সেই পাখির বাসার কাছে উপস্থিত হল। সে দেখল যে বাসার কাছে কপোত শাবকগণ লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। সে জাল পেতে তাদের ধরে ফেলল। কপোত-কপোতী শাবকদের খাদ্য দানে সদা আগ্রহী থাকত। এবার তারা খাদ্য মুখে নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছল। কপোতী দেখল যে তার হৃদয়ের অংশ শিশু শাবকগণ জালে আটকা পড়েছে ও আর্তনাদ করছে। তাদের এই পরিস্থিতিতে দেখতে পেয়ে কপোতীর দুঃখের সীমা থাকল না। সে বিলাপ করতে করতে শিশু শাবকদের দিকে ছুটে গেল। ভগবানের মায়ার প্রভাবে তার চিত্ত বিদারণ হচ্ছিল। উদ্দাম স্নেহের রজ্জুতে কপোতীর হৃদয় বাঁধা পড়ে ছিল। নিজ শাবকদের জালে বদ্ধ দেখে তার নিজের শরীরের বিস্মরণ হল এবং সে স্বয়ং কাছে গিয়ে জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। যখন কপোত দেখল যে তার প্রাণাধিক প্রিয় শাবকগণ জালে বন্দী এবং তার প্রিয় ভার্যারও সেই একই দশা, তখন সে শোকে বিহ্বল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। যথার্থরূপেই তার অবস্থা তখন অতি করুণ ছিল। আমি অভাগা, আমি দুর্মতি। হায়! হায়! আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল। দেখো, না আমার তৃপ্তি হল, না আমার আশা পূর্ণ হল। এমনকি আমার ধর্ম, অর্থ এবং কামের মূল এই গৃহস্থাশ্রমই নষ্ট হয়ে গেল। হায়! আমার প্রিয়তমা আমাকে ইষ্ট জ্ঞানে সেবা করত, আমার মতানুসারে চলত, আমার অঙ্গুলি নির্দেশে কাজ করত। সে তো সম্পূর্ণভাবেই আমার উপযুক্ত ছিল। আজ সে আমাকে এই নির্জন গৃহে একলা রেখে আমাদের সহজ-সরল সন্তানদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করছে। আমার সন্তানগণ মারা পড়ল। আমার প্রিয়তমাও চলে যাবার পথে। এই জগতে আমার আর কী কাজ বাকি আছে? আমার মতন দীনহীনের এই বিষাদাচ্ছন্ন জীবন, প্রিয়তমা ছাড়া জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। আর আমি কেমন করে এই নিঃসঙ্গ গৃহে জীবন-যাপন করব? রাজন্ ! কপোত শাবকগণ জালে বদ্ধ হয়ে ছটফট করছিল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তারা মৃত্যুর কবলিত হয়েছে, কিন্তু তবুও সেই মূর্খ কপোত সব দেখে কাতর হয়ে পড়ল এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জালে লাফিয়ে পড়ল। সেই ব্যাধ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল। গৃহস্থাশ্রমী কপোত-কপোতী ও তাদের শাবকদের জালে ধরা দেখে সে খুব প্রসন্ন হল। সে ভাবল যে তার কাজ হাসিল হয়েছে এবং তাই সে তাদের নিয়ে চলে গেল।
যে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে রয়েছে, বিষয়ভোগে ও স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে এবং তাদের ভরণপোষণেই দিন-রাত ব্যস্ত থাকে, সে কখনো শান্তি পেতে পারে না। সে ওই কপোতবৎ নিজ কুটুম্ব-সহ কষ্ট ভোগ করে থাকে। এই মানব-শরীর বস্তুত মুক্তির উন্মুক্ত দ্বার। মানব-শরীর লাভ করেও যে কপোতবৎ নিজ ঘরগৃহস্থালিতেই আবদ্ধ থাকে সে অনেক উচ্চে আরোহণ করেও নিম্নগামী হচ্ছে। শাস্ত্রের ভাষায় সে 'আরূঢ়চ্যুত'॥"
অবধূত দত্তাত্রেয় বলতে লাগলেন- "রাজন্! প্রাণীকুলের অনিচ্ছা, চেষ্টাচরিত্র না করা ও প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও যেমন পূর্বকর্মানুসারে দুঃখের ভোগ হয় তেমনভাবেই স্বর্গে অথবা নরকে যেখানেই থাকুক না কেন ইন্দ্রিয়ানুভূত সুখও প্রাপ্তি হয়। অতএব সুখ-দুঃখের রহস্য জানা বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে উচিত হল, সে যেন তার জন্য ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা আদপেই না করে। যাচনা ব্যতিরেকে, কামনা না রেখে অনায়াসে যা পাওয়া যায় তা শুষ্ক, মধুর, আস্বাদযুক্ত অথবা কম-বেশি যাই হোক না কেন, অজগর বৃত্তির ন্যায় বুদ্ধিমান পুরুষের সবেতে উদাসীন থেকে তার দ্বারাই জীবন-ধারণ করা উচিত। অজগর খাদ্য সমাপ্ত না হলে তার আহরণের চেষ্টা করে না; বহুদিন সে অনাহারেই কাটিয়ে

দেয়। অজগর বৃত্তি ধারণ করা ব্যক্তি খাদ্যের অপ্রাপ্তিকে প্রারব্ধ ভোগ জ্ঞান করবে এবং বিনা প্রচেষ্টায় স্বতপ্রাপ্ত আহারে সন্তুষ্ট থাকবে।

শরীরের মনোবল, ইন্দ্রিয়বল ও দেহবল থাকলে সে যেন নিশ্চেষ্ট থাকে। দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে নিদ্রার ভাব না থাকলেও যেন নিদ্রাবস্থায় কালাতিপাত করে; কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে বিরত থাকে। রাজন্! আমি অজগর থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করেছি। (অজগর যেরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকলেও নিদ্রিত প্রাণীর ন্যায় অবস্থান করে, সাধক ব্যক্তিরও সেরুপ দেহ ও ইন্দ্রিয়তে বিষয় সুখলাভের জন্য বল থাকলেও তিনি তা প্রয়োগ না করে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকবেন এটাই শিক্ষা।)

সমুদ্রের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, সাধক ব্যক্তির সর্বদা প্রসন্ন চিত্ত ও গম্ভীর থাকা উচিত; তার ভাব গভীর, অপার এবং অসীম হওয়া কাম্য এবং কোনো কারণেও তার মধ্যে ক্ষোভের আগমন হওয়া ঠিক নয়। সে জোয়ার-ভাটা, তরঙ্গরহিত শান্ত সমুদ্রবৎ থাকবে। দেখো! সমুদ্র বর্ষাকালে নদীতে বন্যার কারণে স্ফীত আর গ্রীষ্মকালে সংকুচিত হয় না। তেমনভাবেই ভগবৎপরায়ণ সাধকেরও জাগতিক পদার্থ প্রাপ্তিতে উল্লসিত আর ক্ষয়ে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়।

রাজন্! আমি পতঙ্গের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছি। পতঙ্গ রূপে মুগ্ধ হয়ে অগ্নিতে ঝাঁপ দেয় এবং পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তেমনভাবেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখতে অসমর্থ ব্যক্তি নারী-দেহ দর্শনেই তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং ঘোর অন্ধকারে, নরকে অধঃপতিত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। সত্যই নারী দেবতাদের সেই মায়া যার জন্য জীব ভগবান বা মোক্ষপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যে মূঢ় ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চন পোষাক-অলংকার আদি বিনাশশীল ভ্রমাত্মক পদার্থে আসক্ত এবং সেগুলির উপভোগের জন্য লালায়িত, সে ক্রমে নিজ বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে পতঙ্গবৎ ধ্বংস হয়ে যায়।

রাজন! সন্ন্যাসীর উচিত যে, সে গৃহস্থগণকে যেন কোনো রকম উত্যক্ত না করে ভ্রমরবৎ নিজ জীবন নির্বাহ করে। তার মাধুকরী একাধিক গৃহ থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (নচেৎ পদ্মফুলের গন্ধে আসক্ত হয়ে তার রস সংগ্রহে মত্ত ভ্রমর যেমন পদ্মপাপড়িতে বন্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়, তেমনই কোনো বিশেষ গৃহস্থের অন্ন নিত্য গ্রহণ করলে সন্ন্যাসী জাগতিক মোহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।) ভ্রমর যেমন ফুলের ছোট-বড় বিচার না করে, সকল ফুলের সার আহরণ করে, তেমনভাবেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত হল যে, ছোট-বড় বিচার না করে সকল শাস্ত্র থেকে সারকথা গ্রহণ করবে।

রাজন্! আমি মৌমাছির কাছে এই শিক্ষা পেয়েছি যে সন্ন্যাসীর পক্ষে সায়ংকাল অথবা আগামীকাল হেতু ভিক্ষা পরিরক্ষণ অনুচিত। তার ভিক্ষাপাত্র শুধুমাত্র হাত ও সংগ্রহ পাত্র উদর হওয়াই কাম্য। সে সঞ্চয়ে রত হলে তার জীবন মৌমাছির মতন দুঃসহ হয়ে উঠবে। এই কথা উত্তমরূপে জেনে নেওয়া দরকার যে, সন্ন্যাসী কখনো পরবর্তী সময়ের (দুপুর হলে রাতের এবং রাত্রি কালে পরবর্তী দিনের) জন্য কিছুই সংগ্রহ করবে না। যদি সংগ্রহ করে তাহলে মৌমাছির মতন সংগ্রহের বস্তুসহ সে প্রাণও হারাতে পারে।



রাজন্! আমি হস্তীর কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, সন্ন্যাসীর কাষ্ঠনির্মিত নারীর স্পর্শ করাও অনুচিত। গর্তের উপর রাখা নকল হস্তিনীর সঙ্গ পেতে যেমন হস্তী গর্তে পড়ে ধরা পড়ে যায়, সেইভাবেই নারীর স্পর্শ সন্ন্যাসীকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে ছাড়ে। বিবেকী পুরুষ কোনো নারীকে কখনো যেন ভোগ্যবস্তু রূপে স্বীকার না করে; কারণ নারী তার পক্ষে মূর্তিমান মৃত্যুস্বরূপ। যেমন বলবান হস্তী অন্য হস্তীর কাছ থেকে হস্তিনীকে কেড়ে নিয়ে সেই হস্তীকে বধ করে, তেমনি তারও মৃত্যু অনিবার্য।

আমি মধু সংগ্রহকারী ব্যক্তির কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, জগতে লোভী পুরুষরা কত কষ্ট করে ধন সঞ্চয় করে থাকে। তারা সঞ্চিত ধন অন্যদের দানও করে না আবার নিজেরাও ভোগ করে

না। যেমন মধু সংগ্রহকারী, মৌমাছির সঞ্চিত মধু কেড়ে নিয়ে যায় সেইরূপ ধনী ব্যক্তিদের সঞ্চিত ধনের একই অবস্থা হয় ;তার উপর লক্ষ্য রাখা অন্য কোনো ব্যক্তি তা ভোগ করে থাকে। তুমি অহরহই তো দেখছ যে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছিদের সংগ্রহ করা মধু তাদের ভোগের পূর্বেই অন্যেরা কেড়ে নিয়ে যায়; ঠিক সেইভাবেই গৃহস্থের অতি কষ্টের সঞ্চিত ধন—যাদের থেকে সে সুখ ভোগের অভিলাষ করে তারা এবং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের সেবায় খরচ হয়ে যায়। (কারণ গৃহস্থ, অতিথি অভ্যাগত সকলের সেবা করে তবে নিজে তা গ্রহণ করে থাকে)।

আমি হরিণের কাছেই এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, বনবাসী সন্ন্যাসীর কখনো বিষয়-সম্পত্তির গুণগান শোনা ঠিক নয়। কারণ ব্যাধের সংগীতে মোহিত হয়ে হরিণ ব্যাধের ফাঁদে পড়ে যেমন প্রাণ হারায় তেমনই সেই সন্ন্যাসীদের দুর্গতি হয়। তুমি তো জানই যে হরিণের গর্ভজাত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নারীদের গীত-বাদ্য-নৃত্যে বশীভূত হয়ে তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন।

এইবার আমি তোমাকে মৎস্যর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার কথা বলছি। মৎস্য টোপে গাঁথা মাংস খণ্ডের লোভে নিজের প্রাণ দেয়। তেমনভাবেই স্বাদলোভী কুমতি ব্যক্তিগণ মনকে চাঞ্চল্য প্রদানকারী নিজ জিহ্বার বশীভূত হয়ে পড়ে ও তাতেই নিজ প্রাণ হারায়। বিবেকী ব্যক্তি খাদ্যবস্তুতে সংযম করে অন্য ইন্দ্রিয়দের অতি শীঘ্রই বশীভূত করে কিন্তু তাতে তার রসনা-ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় না। রসনা-ইন্দ্রিয়কে তার আহার্য থেকে বিরত রাখলে তা আরও প্রবল হতে দেখা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত রসনেন্দ্রিয় বশীভূত না হয় ততক্ষণ অন্য সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হলেও মানুষ জিতেন্দ্রিয় হতে পারে না। যেই রসনেন্দ্রিয় বশীভূত হয়ে গেল তখন ধরা যেতে পারে যে সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হল।"

অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন- "হে নৃপনন্দন! পুরাকালে বিদেহনগরী মিথিলাতে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা নিবাস করত। আমি তার কাছ থেকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছি ; তা সাবধানে শোনো। সে স্বেচ্ছাচারিণী তো ছিলই, রূপবতীও ছিল। এক রাত্রে কোনো পুরুষকে রমণস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে উত্তমরূপে বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। হে নবরত্ন ! প্রকৃতপক্ষে তার কামনা পুরুষসঙ্গ নয়, তা কেবল ধনসম্পদের উপর ছিল। এই বদ্ধমূল ধারণায় সে কোনো পুরুষকে সেদিক দিয়ে যাতায়াত করতে দেখলেই ভাবত যে সেই ব্যক্তি ধনী এবং ধন দিয়ে তাকে উপভোগ করবার জন্য তার কাছে আসছে। আগন্তুক ব্যক্তি তাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলে সেই সংকেত উপজীবী বেশ্যা ভাবত যে অবশ্যই এই বার তার কাছে এক ধনী ব্যক্তির আগমন হবে যে তাকে প্রভূত ধন দেবে। তার চিত্তে দুরাশার বৃদ্ধি হতেই থাকল। সে দ্বারে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকল। তার চোখে ঘুম ছিল না। কখনো ঘরে কখনো বাহিরে এইভাবে সে অনবরত পায়চারি করছিল। এইভাবে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হল। রাজন্! আশা বিশেষভাবে অর্থের আশা অতি অনর্থকর। বিত্তবান ব্যক্তির আশায় অপেক্ষা করে করে তার মুখ শুকিয়ে গেল আর চিত্তও ব্যাকুল হল। এবার তার এই বেশ্যাবৃত্তি থেকে বৈরাগ্য হল, তাতে দুঃখের ভাবনা জন্মাল। যদিও হতাশাজনিত দুঃখে তার মনে বৈরাগ্য এসেছিল তবুও এরূপ বৈরাগ্যও সুখের হেতু হয়। যখন পিঙ্গলার চিত্তে এইরকম বৈরাগ্য ভাবনা জেগে উঠল তখন সে এক গীত গেয়েছিল। আমি তোমাকে সেটি শোনাচ্ছি। রাজন্! মানব আশারূপী ফাঁসির মঞ্চে ঝুলছে। সেই রজ্জুকে তরবারিসম কাটার যদি কোনো বস্তু থাকে তা কেবল বৈরাগ্যই।

প্রিয় রাজন্ ! যার জীবনে বৈরাগ্যের আগমন হয়নি এবং যে এইসব প্রহেলিকায় বীতশ্রদ্ধ হয়নি সে কখনো শরীর আর এটির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় না; যেমন অজ্ঞানী পুরুষ মমতা পরিত্যাগ করার কথা চিন্তাও করে না।

পিঙ্গলা এই গান গেয়েছিল – হায়! হায়! আমি ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হয়েছি। আমার মোহাধিক্যর দিকে তাকিয়ে দেখো। আমি এই দুষ্ট পুরুষদের কাছে অস্তিত্বরহিত বিষয় সুখের লালসা করেছি। ঘটনা বাস্তবেই অতি দুঃখের। আমি সত্যই মূর্খ। দেখো! আমার এত কাছে, হৃদয়ে আমার যথার্থ স্বামী বিরাজমান। তিনিই বাস্তবিক প্রেম, সুখ এবং পরমার্থের প্রকৃত সম্পদদাতা। জগতের পুরুষগণ অনিত্য কিন্তু তিনি নিত্য। হায়! হায়! আমি তাঁকে ভুলে গিয়ে সেই সকল পুরুষদের সেবায় যুক্ত হলাম যারা আমার কোনো কামনাই পূরণ করতে অসমর্থ। উলটে তারাই আমায় দুঃখ-ভয়, আধি-ব্যাধি, শোক ও মোহ দিয়েছে। এটাই আমার চরম মূর্খামি যে আমি তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকি। আক্ষেপের কথা যে আমি অতি নিন্দনীয় বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছি এবং অনর্থক আমার শরীর ও মনকে কষ্ট দিয়েছি। আমার এই শরীর বিক্রীত হয়ে গেছে। লম্পট, লোভী এবং নিন্দনীয় ব্যক্তিরা একে কিনে ফেলেছে। আর আমি এতই মূর্খ যে এই শরীর দিয়েই অর্থ এবং রতিসুখ কামনা করি। ধিক্কারজনক আমার আচরণ! এই শরীর এক কক্ষ মাত্র। এর ভিতর অস্থির আঁকাবাঁকা কীলক ও খোঁটা; চামড়া, লোম ও নখে একে ঢেকে দেওয়া

আছে। এর দ্বারসংখ্যা নয় যার থেকে ক্রমাগত মলাদি বস্তু নির্গত হতেই থাকে। এর সঞ্চিত সম্পত্তিরূপে আছে কেবল মল ও মূত্র। আমি ছাড়া এমন নারী কে আছে যে এই স্থূল শরীরকে প্রিয় জেনে সেবন করবে। এই নগরী বিদেহনগরী অর্থাৎ জীবন্মুক্ত নগরীরূপে খ্যাত। কিন্তু এর ভিতর বাস করেও আমিই সর্বাধিক মূর্খ ও দুষ্ট; কারণ একমাত্র আমিই তো সেই আত্মভাব, অবিনাশী এবং পরমপ্রিয়তম পরমাত্মাকে ভুলে গিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গ কামনা করি। আমার হৃদয়ে বিরাজমান প্রভু সমস্ত প্রাণীকুলের হিতৈষী, সুহৃদ, প্রিয়তম, স্বামী এবং আত্মা। এবার আমি নিজেকে সমর্পণ করে তাঁকে কিনে ফেলব এবং লক্ষ্মীসম তার সঙ্গে বিহার করব। ওরে আমার মূঢ় চিত্ত! তুই বল, জগতের বিষয়ভোগ এবং তার দাতা পুরুষগণ তোকে কী সুখ দিয়েছে? ওরে! তারা নিজেরাই তো অহরহ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হচ্ছে। আমি কেবল আমার বা মানুষদের কথা বলছি না; দেবতারাও কী ভোগদ্বারা নিজ জায়াদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে? সেই অভাগাগণ তো নিজেরাই কালের মুখে পড়ে আর্তনাদ করছে। নিশ্চয়ই আমার কোনো সুকৃতির জন্য বিষ্ণু ভগবান আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন তাই দুরাশা হলেও আমার এইরূপ বৈরাগ্য হয়েছে। আমার বৈরাগ্য অবশ্যই সুখপ্রদ হবে। আমি যদি মন্দ কপাল হতাম তাহলে আমাকে এমন ক্লেশ ভোগ করতে হত না যাতে বৈরাগ্য আসে। মানুষ বৈরাগ্যের সাহায্যেই গৃহাদি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে। এখন আমি ভগবানের এই করুণা সমাদর সহকারে নতমস্তক হয়ে গ্রহণ করছি এবং বিষয়ভোগের দুরাশা ত্যাগপূর্বক সেই জগদীশ্বরের শরণাগত হচ্ছি। এবার প্রারব্ধানুসারে যা কিছু পাব তাতেই জীবন নির্বাহ করব এবং পরম সন্তোষে ও শ্রদ্ধা সহকারে বাস করব। অন্য পুরুষদের উপর দৃষ্টি না দিয়ে নিজ হৃদয়েশ্বর আত্মস্বরূপ প্রভুর সহিত বিহার করব। জীব সংসার-কূপে নিপতিত। বিষয় লোভ তাকে অন্ধ করে রেখেছে এবং কালরূপ অজগর তাকে গ্রাস করে আছে। এই অবস্থায় তাকে ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম? জীব বিষয়-সম্পদ থেকে যখন বিরত হয় তখন সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অতএব সাবধানে অবলোকন করে যাও যে, সমস্ত জগৎ কালরূপ অজগরের মুখে অবস্থান করছে।"

অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন—"রাজন! পিঙ্গলা বেশ্যা এইরূপ প্রত্যয় সহকারে তার প্রিয় ধনীদের দুরাশা ও তাদের পদে মিলিত হওয়ার লালসা পরিত্যাগ করল এবং শান্ত হয়ে শয্যায় নিদ্রাগত হল। বস্তুত আশাই অতি বড় দুঃখ ও নিরাশাই অতি বড় সুখ; কারণ পিঙ্গলা বেশ্যা যখন পুরুষের আশা ত্যাগ করল তখনই কেবল সে সুখে নিদ্রা গেল।"

অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন– "রাজন্! অতি প্রিয় বস্তুর সঞ্চয়ের প্রবণতা মানুষের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথা বুঝে অকিঞ্চনভাবে থাকে অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে তো দূরের কথা, মনের দ্বারাও কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না তার অনন্ত সুখস্বরূপ পরমাত্মা লাভ হয়। এক কুরর পাখি নিজ চঞ্চুতে একটা মাংসখণ্ড ধারণ করেছিল। সেই সময় অন্য শক্তিশালী পাখিরা যাদের কাছে মাংস ছিল না, সেই মাংসখণ্ডকে কেড়ে নেওয়ার জন্য তাকে ঘিরে ফেলে ঠোকরাতে লাগল। যখন কুরর পাখি নিজ চঞ্চু থেকে সেই মাংস খণ্ড ফেলে দিল, তখনই সে নিস্তার পেল।

আমার মানাপমান বোধ আদপেই নেই। গৃহী পরিবারযুক্ত ব্যক্তিদের যে চিন্তা থাকে তা আমার নেই। আমি নিজ আত্মাতেই রমণ করি এবং নিজের সঙ্গেই খেলা করি। এই শিক্ষা আমি বালকের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। তাই বালকবৎ আমি আনন্দে থাকি। এই জগতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দমগ্ন থাকে–প্রথম আত্মভোলা নিশ্চেষ্ট ক্ষুদ্র শিশু ও দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে গুণাতীত হয়ে গেছে।

একদা কোনো এক কুমারী কন্যার বাড়িতে তাকে পছন্দ করবার জন্য কয়েকজনের আগমন হয়েছিল। বাড়ির অন্যরা কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব তাই কুমারী কন্যা স্বয়ং নিয়েছিল। রাজন্ ! তাঁদের খাওয়ার জন্য সে তখন গৃহাভ্যন্তরে একান্তে ধান কাঁড়তে প্রবৃত্ত হল। সেই কর্মে তার হস্তের শঙ্খবলয়ে অত্যধিক শব্দ হতে লাগল। ধান কাড়ার কার্য স্বহস্তে করা দারিদ্র্যসূচক; তাই শঙ্খবলয়ের রণন বন্ধ করবার জন্য লজ্জিত কুমারী এক এক করে সমস্ত শঙ্খবলয় ভেঙে ফেলল। তার দু-হাতে কেবল দুটি করে বলয় অবশিষ্ট রইল। তখন সে আবার ধান কাঁড়তে শুরু করল। কিন্তু সেই দুটো করে দু-হাতে শঙ্খবলয় আবার শব্দ করতে শুরু করল। তখন সে দু-হাতের একটা করে শঙ্খবলয় আবার ভেঙে ফেলল। যখন হাতে একটা করে শঙ্খবলয় অবশিষ্ট থাকল তখন কোনো শব্দ ছাড়াই ধান কাঁড়ার কার্য চলতে থাকল। হে রিপুদমন ! জনগণের আচরণ-বিচার পর্যবেক্ষণ করবার জন্য আমি তখন এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি সেখানে এই শিক্ষা গ্রহণ করলাম যে বহু ব্যক্তি যখন একত্রে থাকেন তখন কলহ হওয়া স্বাভাবিক হয় এবং যখন কেবল দুজনও থাকে তখন কথাবার্তা তো চলতেই থাকে; তাই কুমারী কন্যার শঙ্খবলয়সম একক বিচরণই উৎকৃষ্ট।

আমি বাণ নির্মাতার কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, আসন ও শ্বাসকে জয় করে বৈরাগ্য ও অভ্যাস সহযোগে নিজের মনকে বশ করে নেওয়া উচিত এবং তারপর অতি সংযম সহকারে তাকে এক লক্ষ্যে সংযুক্ত করাই বিধেয়। যখন পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতে মন স্থির হয় তখন কর্মবাসনা কলুষ ধীরে ধীরে অপসৃত হতে থাকে। অগ্নি শান্ত হয় ইন্ধন অবলুপ্তিতে; তেমনভাবেই মন শান্ত করার উপায় সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে, রজোগুণী ও তমোগুণী বৃত্তির হ্রাস করার চেষ্টা করায়। এইভাবে যার চিত্ত আত্মাতেই স্থির নিরুদ্ধ হয়ে যায় তার অন্তরে বাহিরে কোনো বস্তুর চিন্তা থাকে না। আমি বাণনির্মাতা কারিগরের কাছে থেকে শিখেছি যে, সে বাণ নির্মাণে এতই তন্ময় হয়েছিল যে তার পাশ দিয়ে দলবল সহ রাজার শোভাযাত্রা চলে যাওয়ার সময়ও তাঁর হুঁশ ছিল না, সে বুঝতেও পারল না।"

অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন-"রাজন! আমি সর্প থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে সন্ন্যাসীর সর্পসম একলা বিচরণ করা উচিত; তার মণ্ডলী সংগঠন করা ঠিক নয়, মঠে অবস্থান করা তো একেবারেই উচিত নয়। সে এক স্থানে থাকবে না, প্রমাদে যুক্ত হবে না, গুহাদিতে নিবাস করবে এবং বাহ্য আচরণে চিহ্নিত হয়ে পড়বে না। সে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না এবং অতি সংযতবাক হবে। এই অনিত্য শরীরের জন্য গৃহ নির্মাণে যুক্ত ঝামেলায় পড়া অসঙ্গত এবং দুঃখের মূল। সর্প অন্যের গৃহে ঢুকে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করে।

এইবার মাকড়সার কাছ থেকে গ্রহণ করা শিক্ষার কথা শোনো। সর্ব প্রকাশক এবং অন্তর্যামী সর্বশক্তিমান ভগবান পূর্বকল্পে অন্য কোনো সাহায্য ছাড়াই নিজ মায়ায় রচিত জগৎকে কল্পের শেষে (প্রলয়কাল উপস্থিত হলে) কালশক্তির দ্বারা বিনাশ করে তাকে নিজের মধ্যে লীন করে নিলেন এবং স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ রহিত একাই অবশিষ্ট থাকলেন। তিনিই সকলের অধিষ্ঠান ও সকলের আশ্রয়স্থল; কিন্তু স্বয়ং নিজ আশ্রয়ে নিজ আধারে নিবাস করেন। তাঁর অন্য কোনো আধার নেই। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই নিয়ামক, কার্য এবং কারণাত্মক জগতের আদিকারণ পরমাত্মা নিজ শক্তি কালের প্রভাবে সত্ত্ব-রজ আদি সমস্ত শক্তিসমূহকে সাম্যাবস্থায় পৌঁছে দেন এবং কৈবল্যরূপে এক এবং অদ্বিতীয়রূপে বিরাজমান থাকেন। তিনি কেবল অনুভব-গম্য এবং আনন্দর ঘনীভূত মূর্তি। কোনো রকমের উপাধির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নেই। সেই প্রভু কেবল নিজ শক্তি কালের দ্বারা নিজ ত্রিগুণাত্মক মায়াকে ক্ষুব্ধ করেন এবং তার পূর্বে ক্রিয়াশক্তির প্রধান সূত্র (মহত্তত্ত্ব) এর রচনা করেন। সেই সূত্ররূপ মহত্তত্ত্বই (মহাজাগতিক বুদ্ধি) ত্রিগুণের প্রথম অভিব্যক্তি ; তা-ই সকল সৃষ্টির মূল কারণ। তার মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব, সূত্রের বন্ধনের মতন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেইজন্যই জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়তে হয়। মাকড়সা নিজ ইচ্ছায় মুখদ্বারা জাল রচনা করে, সেই জালেই তার বিচরণ হয় এবং শেষকালে তা সে নিজেই উদরস্থ করে। তেমনভাবেই পরমেশ্বর এই জগৎকে তাঁর থেকেই সৃষ্টি করেন, তিনি সেই সৃষ্টিতে নিজেই জীবরূপে বিচরণ করেন এবং শেষে তাকেই নিজের মধ্যে লীন করে নেন।

রাজন! আমি ভৃঙ্গী কীট থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যদি কেউ স্নেহে, দ্বেষে অথবা ভয়েও জেনে-শুনে একাগ্ররূপে নিজ মন কারো উপর সুস্থিত করে তখন সে সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে যায়। রাজন! যেমন ভৃঙ্গী একটি কীটকে ধরে দেওয়ালে নিজের থাকবার জায়গায় বন্দী করে রাখে এবং সেই কীট ভয়ে তাকে স্মরণ করতে করতে নিজ শরীর ত্যাগ না করেই তার শরীরবৎ হয়ে যায়।

রাজন! এইভাবে আমার শিক্ষা গ্রহণ বহু গুরুর কাছ থেকে হয়েছে। এখন নিজ শরীর থেকে আমি যা শিক্ষা গ্রহণ করেছি, তা বলব। মন দিয়ে শোনো। এই শরীরও আমার এক গুরু, কারণ বিবেক-বৈরাগ্য শিক্ষা গ্রহণ সেখান থেকেই। জীবন মরণ তো এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই শরীর ধারণ করে রাখার একমাত্র ফল হল, অবিরাম দুঃখ ভোগ করেই যাও। তত্ত্ববিচার করবার সাহায্য শরীর থেকে অবশ্যই পাওয়া যায়, তবুও শরীরকে কখনো আমি একান্ত আপন ভাবি না। এই বিচার নিত্য রাখি যে এই শরীর একদিন শৃগাল-কুকুরে ভক্ষণ করবে। তাই আমি শরীর থেকে অসংলগ্ন হয়ে বিচরণ করি। মানুষ যে শরীরকে সুখ দেওয়ার জন্য বহু রকম কামনা ও কর্ম করে এবং স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ হাতি-ঘোড়া, ভৃত্য -গোলাম, ঘর-দালান এবং আত্মীয়-স্বজনদের বিস্তার করে তাদের লালন পালনে যুক্ত থাকে, অনেক কষ্ট সহ্য করে ধন সঞ্চয় করে; অথচ আয়ু শেষ হলে সেই শরীর নিজে নষ্ট হয়ে গেলেও বৃক্ষবৎ অন্য শরীরের জন্য বীজ বপন করে তার জন্যও দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা করে যায়। সতিনদের পতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা তো এক জানা সত্য ঘটনা। তেমনভাবেই জীবকে জিহ্বা একদিকে অর্থাৎ সুস্বাদু খাদ্যের দিকে, পিপাসা জলের দিকে, জননেন্দ্রিয় স্ত্রীসম্ভোগের দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে; তেমন করেই ত্বক, উদর ও কর্ণও ভিন্ন ভিন্ন দিকে যথা—কোমল স্পর্শ, উত্তম খাদ্য ও মধুর শব্দর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আবার নাসিকা সুন্দর গন্ধ অভিমুখে ও চঞ্চল নেত্র অন্য কোনো সুন্দর রূপ দর্শনে নিয়ে যেতে চায়। এইভাবে কর্মেন্দ্রিয়

ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েই জীবকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ভগবান নিজ অচিন্ত্য শক্তি মায়াদ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, ডাঁশ এবং মৎস্য আদি বহু যোনী সৃষ্টি করেও পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। তখন তিনি মানবশরীর সৃষ্টি করলেন। এই মানবশরীর এমন বিবেক-বিচার সম্পন্ন যে তা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করতে সক্ষম। সেই মানব শরীর সৃষ্টি করে তিনি পরমানন্দ অনুভব করলেন। মানব শরীরও অনিত্য, কারণ মৃত্যু সবসময় তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মানব শরীর দ্বারা পরমার্থ লাভ হওয়া সম্ভব। তাই বহু জন্মের পর এই অত্যন্ত দুর্লভ মানব শরীর পেয়ে বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে এই যথাযথ যে, সে অনতিবিলম্বে মৃত্যুর পূর্বেই যেন মোক্ষপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। এই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মোক্ষই। বিষয় ভোগ তো সব যোনিতে সম্ভব, তাই তারজন্য এই অমূল্য জীবন হারানো ঠিক নয়।
রাজন! এই সব চিন্তাভাবনা করে আমার জগতের উপর বৈরাগ্য এল। আমার হৃদয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ঝলমল করছে। আমার আসক্তিও নেই, অহংকারও নেই। এখন আমি নিশ্চিন্তে বিচরণ করে থাকি। রাজন্! কেবল গুরুই যথেষ্ট ও সুদৃঢ় বোধ দান করেন না; তার জন্য নিজ বুদ্ধি সহযোগে অনেক কিছু ভাবনাচিন্তা করারও দরকার হয়ে থাকে। দেখো ! ঋষিগণও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে লাভ করবার বহু পথের কথা জানিয়েছেন। (যদি তুমি স্বয়ং বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত না হও তবে কেমন করে ব্রহ্মের স্বরূপকে জানতে পারবে?)"
ব্রহ্মজ্ঞ অবধূত দত্তাত্রেয় রাজা যদুকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। যদু তাঁর পূজা বন্দনা করলেন এবং দত্তাত্রেয় তাঁর অনুমতি নিয়ে অতি প্রসন্ন হয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। এইভাবে রাজা যদু দত্তাত্রেয়ের উপদেশ ধারণ করে আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং সমদর্শী হয়েছিলেন।
সবশেষে উপসংহার হচ্ছে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গুরু অপরিহার্য। তবে গুরু কেবল মানবরূপে সীমাবদ্ধ নন—ঈশ্বর স্বয়ং কখনো দেবরূপে, কখনো প্রকৃতির মধ্য দিয়েও সাধকের গুরু হয়ে ওঠেন। তাই প্রকৃতি আমাদের কাছে শুধু বাহ্য জগত নয়, বরং পরম গুরুর প্রতিফলন, যার মাধ্যমে আমরা সত্য, জ্ঞান ও মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারি।

তথ্যসূত্র:- শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ (১১শ স্কন্ধ/৭ম,৮ম ও ৯ম অধ্যায়)



রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও বাঙ্গালীত্ব

উচ্ছ্বাস তালুকদার

দেশপ্রেম ধর্মসঙ্গত, কবিগুরুকে নিয়ে একের পর এক অপপ্রচার হয়েই থাকে। সাহিত্যের মাধ্যমেই উনি সনাতন ধর্মের যে শিক্ষা দিয়েছেন সেটাও অসাধারণ। বাংলা ভাষাকে অনেক ব্যাকরণবিদ সংস্কৃতের কন্যা বলে থাকেন কারণ বাংলা ভাষার রূপান্তর সংস্কৃত থেকেই হয়েছে। একটা সময় এই বাংলা ভাষাকে সহ্য করতে পারতো না আব্রাহামিক অনুসারীরা, হিন্দুয়ানী ভাষা বলে প্রচার করতো। কিন্তু এখন নিজের স্বার্থে বাংলাকে নিজেদের ভাষা বানিয়ে ফেলেছে, আর বিশুদ্ধ বাংলাকে ও বাঙ্গালীদের বিরোধিতা শুরু করেছে শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে।

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।।'

গুরুদেব রচিত বাংলা গানের এই দুটো লাইন বুঝিয়ে দেয় উনি কতটুক দেশপ্রেমিক ছিলেন। নিজের দেশ তথা বাংলা ভূমি ও বাংলার সংস্কৃতিকে উনি কতটা আপন করেছিলেন সেটা না বললেও চলে কিন্তু আজকাল ভাষা নিয়ে যারা রাজনীতি করে, বাংলার সংস্কৃতি যাদের পছন্দ নয়, বাঙ্গালীত্ব নিয়ে যারা কখনো মন থেকে গর্ব করে নি - তারা এসেছে গুরুদেব বাঙ্গালী কি না সেটার শংসাপত্র দিতে। যারা গুরুদেবকে বাঙ্গালী মানছেন না তাদের প্রথম যুক্তি হচ্ছে গুরুদেবের আসল পদবী 'ঠাকুর' নয় 'কুশারী'। এবার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এর বই থেকে একটু ইতিহাস দেখা যাক -

"কুশারীরা ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর বংশজাত। দীন মহারাজ ক্ষিতিশূরের নিকট 'কুশ' নামক গ্রাম (বর্ধমান জিলা) পাইয়া গ্রামীণ হন এবং কুশারী নামে খ্যাত হন। দীন কুশারীর অষ্টম কি দশম পুরুষ পরে জগন্নাথ। জগন্নাথের দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম হইতে ঠাকুরবংশের ধারা চলিতেছে। অপর তিন পুত্রের ধারা লুপ্ত বা প্রায়লুপ্ত। পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র রামানন্দের দুই পুত্র মহেশ্বর ও শুকদেব হইতে ঠাকুরগোষ্ঠীর কলিকাতা-বাস আরম্ভ।"

.......মহেশ্বরের পুত্র 'পঞ্চানন'কে ওই অঞ্চলের মানুষ 'ঠাকুর মশায় ' বলে সম্বোধন করতেন এবং সেসময়ের ইংরেজদের কাছেও 'ঠাকুর' বলে পরিচিত হন। অর্থাৎ কুশারী'র পরিবর্তে কাগজে পত্রেও 'ঠাকুর' প্রচলন হয়। তাহলে এটুকু স্পষ্ট 'কুশারী'ও তাদের আসল পদবী নয়, গ্রামের কারণে এই পদবীর দ্বারা পরিচিত ছিলেন। তারা মূলত পিরালী ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত ছিলেন (সে ইতিহাস থাক আজকে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃপুরুষের আবাসভূমি বাংলাদেশের খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত ঘাটভোগ ইউনিয়নের পিঠাভোগ গ্রামে। কুশারী পদবী দ্বারা যখন পরিচিত হয়েছেন তখনও কিন্তু বাংলায় তাদের বংশের লোকজন বিস্তার লাভ করেছিলেন আর সেই বিস্তার লাভ শুরু হয় আদিশূরে'র সময় থেকেই অর্থাৎ ওইসময় থেকেই উনারা বাংলা ও বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে নিজেরাও বাঙ্গালী হয়ে গিয়েছিলেন। যাই হোক এবার পঞ্চানন থেকে বংশধারা দেখিয়ে দেই -

পঞ্চানন → (২ পুত্র) জয়রাম ও রামসন্তোষ → (জয়রামের চার পুত্র) আনন্দীরাম, নীলমণি (জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারের উদ্ভব করেন), দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম → (নীলমণির তিন পুত্র ও এক কন্যা) রামলোচন (পুত্রহীন), রামমণি, রামবল্লভ ও কমলমণি → (রামলোচন ভ্রাতা রামমণির পুত্রকে গ্রহণ করেন) দ্বারকানাথ → (৩ পুত্রের নাম পাওয়া যায় তবে কিছু স্থানে ৪ পুত্র ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়) দেবেন্দ্রনাথ, গিরিন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ → (দেবেন্দ্রনাথ এর ১৫ জন সন্তান) ১৪ তম সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতএব এটুকু স্পষ্ট হলো যে পূর্বের কুশারী ও পরবর্তী পরিচয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মধ্যে বাঙ্গালীয়ানা অনেক পুরাতন। পূর্বের কুশারীদের যদি বাঙ্গালী নাও মানা হয় তাও ধীরে ধীরে যে বিবর্তন হয়েছে সেটা সহজেই বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ 'প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর' বাংলার সমাজ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন। উনাদের পূর্ব পুরুষরা বাংলার অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ দ্বারা বর্তমানে নির্দিষ্ট দেশ তথা আমার জন্মভূমিকে বুঝালেও একসময় অখণ্ড বঙ্গকেও বাংলাদেশ বুঝাতো (ব্রিটিশ ও তার পূর্বের সময়ের সাহিত্যতে পেয়ে যাবেন)। অতএব সেটা হোক খুলনা কিংবা কলকাতা, পুরোটা নিয়েই পূর্বের বাংলাদেশ তথা অখণ্ড বঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধে রয়েছে -



"বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলাপ্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারী দফতরের কাঁচিতে তারা ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি।"

এখানে ঠাকুর আমাদের বলতে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেটা স্পষ্ট। আরেকটি দাবি উঠেছিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি ইংরেজদের দালালি করতেন। তারা হয়তো জানে না যে ঠাকুরকে দেওয়া 'নাইট উপাধি' উনি বর্জন করেছিলেন। উপরের উল্লেখিত প্রবন্ধের অন্য অংশে আছে -

"এমন দিন ছিল যখন বাঙালি বিদেশে গিয়ে আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরোনো কাপড়ের মতো ছিঁড়ে ফেলতে পারত; বিলেতে গিয়ে ভাষাকে সে দিয়ে আসত সমুদ্রে জলাঞ্জলি, ইংরেজভাষিণী অনুচরীদের সঙ্গে রেখে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা চাপা দিয়ে তার উপরে ইংরেজির জয়পতাকা দিত সগর্বে উড়িয়ে। আজ আমাদের ভাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলাভাষীকে মাহাত্ম্য দিয়েছে। বৎসরে বৎসরে জেলায় জেলায় সাহিত্যসম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এ নিয়ে তাকে চেতিয়ে

তুলতে হয় নি, হয়েছে স্বভাবতই।"
এরপরেও গুরুদেবকে ইংরেজদের দালাল বলা যায় কি? হ্যাঁ উনি ইংরেজদের প্রশংসা করেছেন কারণ আমাদের যে মাতৃভাষাপ্রীতি, স্বদেশ প্রীতি, স্বাদেশিক ঐক্য সেগুলো ইংরেজদের থেকেই শিখেছি বলে ঠাকুরের মত। এটা খুব একটা ভুল নয়, কারণ তারা যদি আমাদের ভাষা ও জাতিগতভাবে আলাদা বিচার না করতো তাহলে হয়তো আমাদের মনে নিজের ভাষা, সংস্কৃতির প্রতি সচেতনতা তৈরি হতো না। এটাকেই হয়তো বিবর্তন বলে। তাছাড়া দেখুন ঠাকুরের বিখ্যাত বিখ্যাত কাজগুলোও বাংলা ভাষাতেই লিখিত। গীতাঞ্জলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ না করলে সেটা তো বৈশ্বিক মর্যাদা পেতো না (কারণ ইংরেজি যে প্রায় সকল দেশের সরকারি ভাষা হিসেবে থাকে সেটা আপনারাও জানেন), তাই এ নিয়ে ইংরেজের দালাল বলাও ব্যর্থ। উনি ওই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে নিজের দক্ষতা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি 'বিশ্বকবি' হয়েছিলেন। আপনারা এই উপমহাদেশের বহিরাগত শক্তিকে আপন করে নিতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আজও আপন করতে পারলেন না!
গুরুদেব বলেছিলেন -
"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালবেসে।।
জানিনে তোর ধনরতন আছে কিনা রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।।"
(স্বদেশ - ২৪)

যারা বঙ্গজননীর মান রেখেছে আমরা যেন তাদের মান রাখতে পারি, তাদের নিয়ে গর্ব করতে পারি - এই কামনাই করবো🙏

তথ্যসূত্র:
১) রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী প্রকাশনী) - খণ্ড ৪, ২৬
২) রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) - খণ্ড ১

দেবী মনসা

স্নেহা গাইন
তথ্যসূত্র ও সহযোগিতায় :- মৃগাঙ্ক রায়



যিনি এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তির উৎস, তাঁর অপার মহিমা, অনন্ত তাঁর রূপ, তিনিই আদ্যাশক্তি মহামায়া। সেই স্বয়ং প্রকাশিতা দেবী ভক্তের কল্যাণে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। দেবীর অনন্ত রূপের মধ্যে বঙ্গদেশে একটি জনপ্রিয় রূপ হলো দেবী মনসা। বরতমানে লোকদেবী হিসেবে পরিচিত হলেও দেবীর উল্লেখ মহা পুরাণগুলোতেও রয়েছে। নাগদেবী হিসেবে তিনি পরিচিত। ভক্তের সকল বিষ তিনি হরণ করেন তাই তার অপর নাম হলো বিষহরি। ব্রহ্মস্বরূপিনী মনসাদেবী হলেন শুদ্ধতার এবং জ্ঞানের প্রতীক। নাগ পঞ্চমী তিথি ও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মা মনসার পূজা করা হয় (শ্রাবণ সংক্রান্তিতেই বেশি হয়) বিষহরি, সিদ্ধিদায়িনী এই দেবীকে কেন্দ্র করে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়েছে। এই কাহিনীগুলিতে দেবীর মাহাত্ম্যের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়াও একাধিক পূরাণে দেবীর উৎপত্তির কাহিনী, রূপের বর্ণনা সহ দেবীর বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়।

দেবী ভাগবত পুরাণ থেকে দেবীর আবির্ভাবের কাহিনী জানা যায়।

পুরা নাগভয়ক্রান্তা বভূবুর্মানবা ভুবি।
গতাস্তে শরণং সর্বে কশ্যপং মুনিপুঙ্গবম্।।
মন্ত্রংশ্চ সসৃজ্যে ভীতঃ কশ্যপো ব্রহ্মণান্বিতঃ।
বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ।।
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীং তাং মনসা সসৃজ্যে তথা।
তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা।।

(দেবীভাগবত: নবম স্কন্ধ, ৪৮.১১-১৩)

সরলার্থ :- "পুরাকালে পৃথিবীতে নাগের ভয়ে ভীত হয়ে মনুষ্যগণ জীবন রক্ষার্থে মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপের শরণাপন্ন হন। ভীত মনুষ্যদের বর্ণনা শুনে, কশ্যপ মুনিও ভীত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। তখন ব্রহ্মার আদেশে কশ্যপ মুনি নাগভয় থেকে মুক্তির জন্য এক বেদোক্ত বীজ অনুসারে জপ-ধ্যান শুরু করলেন। তৎকালে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা ধ্যানরত কাশ্যপ মুনির মন হতে আবির্ভূত হলেন; তাই তাঁর নাম হল মনসা।"

মনসা দেবীর প্রতিমা রূপ সাধারণত এক সৌম্য, শান্ত, দীপ্তিময় রূপের মিলিত প্রকাশ। দেবীর শরীরের বর্ণ সোনালী বা কখনো কখনো সবুজাভ করা হয়। এটি সাপের সঙ্গে প্রতিকীকরণ। দেবীর রূপের বর্ণনা দেবীভাগবত পূরাণে যা পাওয়া যায়-

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।।
মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবরজ্ঞানিনাং বরাম্।
সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে।।

(দেবীভাগবত: নবমস্কন্ধ, ৪৮.২-৩)

সরলার্থ :- "যাঁর দেহের বর্ণ শ্বেতচম্পক ফুলের মত শুভ্র, অঙ্গে বিবিধ প্রকারের রত্নভূষণ শোভা পাচ্ছে, যিনি অগ্নিবর্ণের রক্তিম বস্ত্র পরিধান করে আছেন; যিনি মহাজ্ঞানযুক্তা, জ্ঞানীদের প্রধানা, শ্রেষ্ঠা, সিদ্ধগণের অধিষ্ঠাতৃদেবী, সিদ্ধিস্বরূপিনী এবং সিদ্ধিদায়িনী তাঁর সদা ভজনা করি।"

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার পরে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি নাগ পঞ্চমী নামে পরিচিত। ভারতে নাগপঞ্চমী একটি জনপ্রিয় উৎসব। এছাড়া ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে দেবীকে পূজা করার প্রচলন দেখা যায়।

দেবীর পূজা বিধি সম্পর্কে শাস্ত্রে পাওয়া যায়-

ইতি ধ্যাত্বা চ তাং দেবীং মূলেনৈব প্রপূজয়েৎ।
নৈবদ্যৈর্বিবিধৈর্ধূপৈঃ পুষ্পগন্ধানুলেপনৈঃ।।

(দেবীভাগবত: নবমস্কন্ধ, ৪৮.৪)

সরলার্থ :- "দেবী মনসার ধ্যান করে মূল মন্ত্রে নানাপ্রকার নৈবেদ্য,
ধূপ, দীপ, পুস্প এবং অনুলেপন দ্বারা পূজা করবে।"

সকল নারীগণ এইসময় ভক্তিসহকারে দেবীর আরাধনায় ব্রতী হন। পুজো শেষে "মনসামঙ্গল বা পদ্মা পুরাণ" পাঠ করা হয়, এটা মূলত মঙ্গল কাব্য। প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজনের জন্য মঙ্গলকাব্যগুলোই ধর্মকে ধারণ করার সহজ পন্থা ছিল। কোথাও দেবী মূর্তি, কোথাও ফণীমনসা গাছ, কোথাও বা চিত্রপটে দেবীকে পুজো করতে দেখা যায়। তবে প্রত্যেক পুজোতে ঘট স্থাপন করা আবশ্যক হয়। অনেকক্ষেত্রে চিত্রপটে মনসামঙ্গল কাব্যের একাধিক ঘটনা তুলে ধরা হয়। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে দেবীর এই লোকগাথা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়, এই লোকগাথার কাহিনী থেকেই দেবীর মহিমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানতে পারেন। এই লোকগাথার মধ্যে মনসামঙ্গলের কাহিনী খুব জনপ্রিয়। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে দেবী মনসার দ্বন্দ্ব, লখিন্দরের বিবাহ ও বেহুলার সতীত্ব ও স্বামীকে ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম এই কাব্যের মূল কাহিনী। নারীশক্তির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই কাব্যের মধ্যে।

দেবীভাগবত পুরাণে দেবীর মহিমা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে -

যে ত্বাং ন পূজয়িষ্যন্তি নিন্দন্ত্যজ্ঞানতো জনাঃ।
লক্ষ্মীহীনা ভবিষ্যন্তি তেষাং নাগভয়ং সদা।।
ত্বং স্বয়ং সর্বলক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে কমলালয়া।
নারায়ণাংশো ভগবান্ জরৎকারুর্মুনীশ্বরঃ।।

(দেবীভাগবত: নবমস্কন্ধ, ৪৮.১৩৩-১৩৪)

সরলার্থ :- "হে দেবী, অজ্ঞানতাবশত যে সকল ব্যক্তি আপনার পূজা না করে নিন্দা করবে,তারা সর্বদাই সর্পভয়ে আক্রান্ত হবে; লক্ষ্মীদেবী তাদের গৃহ হতে চলে যাবেন।

আপনি জগতের লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠের কমলাদেবী স্বরূপিনী; তাই ভগবান নারায়ণের অংশসম্ভূত জরৎকারু মুনি আপনার স্বামী।"

দেবরাজ ইন্দ্র কতৃক বর্ণিত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যারা মনসাদেবীকে নিন্দা করেছেন তারা সর্বদা সর্পভয়ে ভীত থাকবে। লক্ষীদেবী একদণ্ড তার গৃহে অধিষ্ঠান করবেন না। কারণ রূপ আলাদা হলেও দুজনেই অভিন্ন, দুজনেই "পদ্মা"। দুজনের মূর্তি পরিকল্পনায় অসম্ভব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভক্তিসহকারে মনসা দেবীর পূজা করলে সে সুখ শান্তিতে, ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়।

পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং দেব্যৈ দদ্যাচ্চ যো বলিম্।
ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কীর্তিমান্ স ভবেদ্ ধ্রুবম্।।

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ : প্রকৃতি খণ্ড,৪৬.৯)

সরলার্থ :- "পঞ্চমী তিথিতে দেবী মনসাকে যে ব্যক্তি বলি প্রদান করে, সে ধনবান, কীর্তিমান এবং পুত্রবান হয়।" ভারতবর্ষে গ্রামীণ অঞ্চলে বিশেষ করে বঙ্গদেশে মা মনসাকে নিয়ে অনেকগুলো কুসংস্কার রয়েছে। বলা হয় মা মনসা নাকি শক্তিশালী একটি সাপিনী ছাড়া আর কিছুই নন, তিনি একচোখে কানা অর্থাৎ একচোখে দেখতে পান না, ধুপ ধুনোর গন্ধ তিনি সহ্য করতে পারেন না, তার পুজোতে ধুপ ধুনো দিলে নাকি তিনি অভিশাপ দেন। এইগুলোর কোনো ভিত্তি নেই বরং এগুলো কুসংস্কার।

অনেকে ভয় পেয়ে দেবীর কাছে মানত করে, তাঁকে ভয় পেয়ে পুজো দেয়। কিন্তু এটা উচিৎ পন্থা নয়। ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে হলে দরকার হয় নিখাদ প্রেম আর ভক্তি। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে দেবী স্বয়ং এসে ধরা দেন ভক্তের কাছে। দেবী তো স্বয়ং জীবজগতের মা। তাঁকে ভয়ে নয় ভক্তি আর প্রেম দিলেই তাঁর কৃপা ভক্তের ওপর বর্ষিত হবে। দেবী সর্বদা কল্যাণময়ী। তিনি ভক্তের সমস্ত বিষ হরণ করেন। বিষ বলতে শুধুমাত্র সাপের বিষ নয়, বিপদ আপদ, রোগ, কুচিন্তা তিনি হরণ করেন।
যে ব্যক্তি যে বস্তু কামনা করে দেবীর উপাসনা করে, দেবীর কৃপায় তার সে সকল কাম্য বিষয় বস্তুই প্রাপ্ত হয়।

জয় মা মনসা 🙏



গণেশ জন্মকথা

এসএসএস সমাচার

সনাতন ধর্মে কল্প অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি কল্পে একই ঘটনা ঘটে কিন্তু কিছু কিছু পরিবর্তনও হয়। গণেশ প্রতি কল্পেই আসেন। কিন্তু একেক কল্পে একেকভাবে আসেন। তেমনি শিব পুরাণ অন্তর্গত শ্বেতকল্পে গণেশের জন্মকথাই বর্ণিত হলো -

একদিন পার্বতীর জয়া-বিজয়া নামক দুই সখী এসে আলোচনা করতে লাগলেন যে 'সখী! সব অনুচরই রুদ্রের। নন্দী, ভৃঙ্গিরাও সব সময়ে শিবের আদেশ পালনেই তৎপর থাকে। যেসব অসংখ্য প্রমথ আছেন, তাঁরাও কেউই আমাদের নয়। তাঁরা সকলেই শিবের আজ্ঞাপালনের জন্য দ্বারে অপেক্ষা করেন। যদিও এঁরা সকলে আমাদেরও, তবু তাঁদের সঙ্গে আমাদের বনিবনা হয় না। সুতরাং পাপরহিতে! আপনাকেও আমাদের জন্য একজন অনুচর সৃষ্টি করতে হবে।'
ব্রহ্মা বললেন-মুনে! সখীরা যখন পার্বতীকে এমন সুন্দর অনুরোধ করেন, তখন তিনি তা হিতকারক মনে করে সেইরূপই করার চিন্তা করলেন। সেই সময় একদিন পার্বতী যখন স্নান করছিলেন, তখন শংকর নন্দীকে ধমক দিয়ে ভেতরে চলে আসেন। শংকরকে আসতে দেখে স্নান করতে করতে জগজ্জননী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে অত্যন্ত লজ্জা পেলেন। তখনই তাঁর সখীদের সেই পরামর্শ হিতকারী এবং সুখপ্রদ বলে মনে হল। পরমায়া পরমেশ্বরী শিব-পত্নী পার্বতী মনে মনে ঠিক করলেন যে, আমার একজন এমন সেবক চাই, যে পরম শুভ, কর্মকুশল এবং আমারই আদেশে তৎপর থাকবে, তা থেকে কখনও সরবে না। এইকথা চিন্তা করে পার্বতীদেবী তাঁর শরীরের ময়লা থেকে এমন এক চেতন পুরুষ নির্মাণ করলেন, যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ শুভ-লক্ষণযুক্ত। তাঁর সর্বাঙ্গ ছিল সুন্দর

এবং দোষরহিত। তাঁর বিশাল সুন্দর শোভাময় দেহ, মহাবল-পরাক্রমসম্পন্ন ছিল। দেবী তাঁকে অনেক বস্ত্র, নানা অলংকার এবং উত্তম আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন- 'তুমি আমার পুত্র, আমার একেবারে নিজের। তোমার মতো প্রিয় এখানে আমার আর কেউ নেই।' পার্বতী এই কথা বলায় সেই পুরুষ তাঁকে নমস্কার করে বললেন।
গণেশ বললেন- 'মা! আমাকে কী কাজ করতে হবে? আপনার আজ্ঞা অনুযায়ী সেই কাজ করব।'
গণেশের জিজ্ঞাসায় পার্বতী তাঁর পুত্রকে বললেন।
শিবা বললেন- তাত! তুমি আমার পুত্র, আমার নিজের। অতএব তুমি আমার কথা শোনো। আজ থেকে তুমি আমার দ্বাররক্ষক হও। সৎপুত্র! আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ যেন হঠাৎ করে আমার মহলের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে, তা সে যে-ই হোক আর যেখান থেকেই আসুক। পুত্র! আমি একথা তোমাকে সত্য করে জানালাম।
ব্রহ্মা বললেন-মুনে! এই কথা বলে পার্বতী গণেশের হাতে একটি শক্ত ছড়ি দিলেন। সেই সময় তাঁর সুন্দর রূপ দর্শন করে পার্বতী হর্ষান্বিত হলেন। তিনি পরম স্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করে প্রীতিভরে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দণ্ডধারী গণরাজকে নিজের দ্বারে স্থাপন করলেন। পুত্র নারদ! পার্বতীনন্দন মহাবীর গণেশ পার্বতীর হিতকামনায় হাতে ছড়ি নিয়ে গৃহদ্বারে পাহারা দিতে লাগলেন। একদিন শিবা নিজ পুত্র গণেশকে দরজায় নিযুক্ত করে সখীদের সঙ্গে স্নান করছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ! সেইসময় ভগবান শিব, যিনি অত্যন্ত কৌতুকপ্রবণ এবং নানাপ্রকার লীলায় নিপুণ, দরজার কাছে এসে পৌঁছলেন। গণেশ তো পার্বতীপতিকে চিনতেন না, তাই বললেন- 'দেব! মায়ের আদেশ ছাড়া তুমি ভেতরে যাবে না। মা স্নান করতে গেছেন। তুমি কোথায় যাবে? এখন এখান থেকে সরে যাও।' এই কথা বলে গণেশ তাঁকে বাধা দেবার জন্য ছড়ি হাতে নিলেন। তাঁকে এরূপ করতে দেখে শিব বললেন- 'মূর্খ! তুমি কাকে বাধা দিচ্ছ? দুর্বুদ্ধে! তুমি কী আমাকে জানো না? আমি স্বয়ং শিব, অন্য কেউ নয়।'
তখন মহেশ্বরের অনুচররা বুঝিয়ে গণেশকে সরাবার জন্য সেইখানে এসে তাঁকে বললেন-শোনো, আমরা প্রধান শিব অনুচররাই দ্বাররক্ষক এবং সর্বব্যাপী ডগবান শংকরের আদেশে তোমাকে সরাবার জন্যই এখানে এসেছি। তোমাকে অনুচর মনে করে আমরা মারিনি, নাহলে তুমি কখন মারা পড়তে! এখন ভাল এতেই হবে যদি তুমি নিজে এখান থেকে দূর হয়ে যাও। কেন বৃথা মৃত্যুকে ডেকে আনছ?
ব্রহ্মা বললেন- মুনে! একথা বললেও গিরিজা-নন্দন গণেশ নির্ভয়েই থাকলেন। তিনি শিব অনুচরদের অগ্রাহ্য করে দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। তখন সব শিব অনুচরেরা গিয়ে শম্ভুকে সমস্ত ঘটনা শোনালেন। মুনে! তাঁদের কাছে সব শুনে জগতের গতিস্বরূপ অদ্ভুত লীলাবিহারী মহেশ্বর তাঁর অনুচরদের ধমক দিয়ে বলতে
লাগলেন। মহেশ্বর বললেন-অনুচরগণ! এ কে, যে এরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে শত্রুর মতো কথা বলছে? এই নতুন দ্বাররক্ষীকে দূর করো। তোমরা নপুংসকের মতো ফিরে এসে তার কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছ? বিচিত্র লীলাকারী প্রভু শংকর একথা বলায় সেই অনুচররা পুনরায় সেখানে ফিরে এলেন। তারপর গণেশ পুনরায় তাঁদের বাধা দেওয়ায় শিব তাঁদের আদেশ দিলেন যে, 'তোমরা খোঁজ করো, এ কে এবং কেন এমন করছে?' অনুচরেরা অনুসন্ধান নিয়ে জানালেন যে 'ইনি শ্রীগিরিজার পুত্র, দ্বারপালরূপে বসে আছেন।' তখন লীলাস্বরূপ শংকর বিচিত্র লীলা করতে চাইলেন এবং তাঁর অনুচরদের গর্বও হ্রাস করতে চাইলেন। তাই অনুচরদের এবং দেবতাদের ডাকিয়ে এনে গণেশের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। কিন্তু কেউই গণেশকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন শূলপাণি স্বয়ং উপস্থিত হলেন। গণেশ মাতার শ্রীচরণ স্মরণ করলেন, শক্তি তখন তাঁকে বলপ্রদান করলেন। সব দেবতাই শিবের পক্ষে এলেন, ভীষণ যুদ্ধ হল। শেষকালে স্বয়ং
শূলপাণি মহেশ্বর তাঁর ত্রিশূল দিয়ে গণেশের মাথা কেটে দিলেন। পার্বতী এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নানা শক্তি উৎপন্ন করে তাঁদের বিনা বিচারে প্রলয় করার নির্দেশ দিলেন। তখন শক্তিরা প্রলয় আরম্ভকরলেন। সেই শক্তিদের প্রজ্বলিত অগ্নিদাহ সর্বদিক জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে লাগল। তা দেখে শিব অনুচরগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল।
মুনে! সেইসময় দিব্যদর্শন নারদ অর্থাৎ তুমি সেখানে এসে উপস্থিত হলে। তোমার সেখানে আসার অভিপ্রায় ছিল দেবতাদের সুখী করা। তুমি তখন দেবতাসহ আমাকে ও শংকরকে প্রণাম করে বললে যে এই বিষয়ে সকলে মিলে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। তখন সেই সব দেবতা মহামনা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন যে এই দুঃখ কী করে প্রশমন করা যায়! অবশেষে তাঁরা সকলে নিশ্চিত হলেন যে যতক্ষণ গিরিজাদেবী কৃপা না করেন, ততক্ষণ সুখ-শান্তি হওয়া সম্ভব নয়। এখন এই বিষয়ে চিন্তা করা বৃথা। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তোমার সঙ্গে সব দেবতা এবং ঋষি ভগবতী শিবার কাছে গিয়ে তাঁর ক্রোধ শান্ত করার জন্য তাঁকে প্রসন্ন করতে লাগলেন। তাঁরা প্রেমপূর্বক শিবাকে

প্রসন্ন করার জন্য নানা স্তোত্র দ্বারা তাঁর স্তুতি করে বারংবার তাঁর চরণে অভিবাদন করলেন। তারপর দেবগণের নির্দেশে ঋষিগণ বললেন।

তাঁরা বললেন- জগদম্বে! তোমাকে নমস্কার! শিবপত্নী! তোমাকে প্রণাম। চণ্ডিকে! তুমি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করো। কল্যাণি! তোমাকে বারংবার প্রণাম। অম্বে! তুমিই আদি শক্তি। তুমিই সদাসারী সৃষ্টির নির্মাণকর্ত্রী, পালিকাশক্তি এবং সংহারকারী। দেবেশি! তোমার কোপে সমগ্র ত্রিলোক বিকল হয়ে রয়েছে, সুতরাং এবার প্রসন্ন হও এবং ক্রোধ শান্ত করো। দেবি! আমরা তোমার চরণে মাথা নত করছি।

ব্রহ্মা বললেন- নারদ! তোমরা সকলে এইভাবে স্তুতি করলেও পরাদেবী পার্বতী তাঁদের দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। তখন সেই ঋষিগণ পুনরায় তাঁর চরণকমলে মাথা নত করে ভক্তিভরে হাত জোড় করে পার্বতীকে নিবেদন করলেন।

ঋষিরা বললেন-দেবি! এখন সংহত হয়ে আমাদের ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অম্বিকে! তোমার স্বামী শিবও এখানে অবস্থিত আছেন, তাঁর দিকেও একটু দৃষ্টিপাত করো। আমরা, (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতা) ও প্রজা- সকলেই তোমার, সকলেই ব্যাকুল হয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পরমেশ্বরী! এঁদের সকলের অপরাধ ক্ষমা করো। শিবে! এবার এঁদের শান্তি প্রদান করো।



ব্রহ্মা বললেন- মুনে! সব দেবর্ষিগণ এই বলে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে হাতজোড় করে চণ্ডিকার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁদের এরূপ কথা শুনে চণ্ডিকা প্রসন্ন হলেন। তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল। তখন তিনি ঋষিদের বললেন।

দেবী বললেন-ঋষিগণ! আমার পুত্র যদি জীবিত হয়ে যায় আর যদি তোমাদের মধ্যে পূজনীয় বলে গণ্য হয়, তাহলে এই সংহার বন্ধ হবে। তোমবা যখন তাঁকে 'সর্বাধ্যক্ষ' পদ প্রদান করবে তখনই পৃথিবীতে শান্তি আসবে, নাহলে তোমরা সুখী হতে পারবে না।

ব্রহ্মা বললেন-মুনে! পার্বতী এই কথা বলায় তোমরা
সব ঋষিগণ দেবতাদের কাছে এসে সমস্ত ঘটনা জানালে। তা শুনে ইন্দ্র আদি সব দেবতা অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। তাঁরা শংকরের কাছে গিয়ে, হাত জোড় করে তাঁর চরণে নমস্কার করে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন। দেবতাদের কথা শুনে শিব বললেন- 'ঠিক আছে, সমস্ত জগৎ যাতে সুখ পায়, তাই করা উচিত। সুতরাং এখন উত্তর দিকে যেতে হবে এবং যে প্রাণীকে প্রথমে পাওয়া যাবে, তার মাথা কেটে এই বালকের শরীরে জুড়ে দিতে হবে।'

ব্রহ্মা বললেন-মুনে! তখন শিবের আদেশ-পালনকারী
সব দেবতারা সেইরূপ করলেন। তাঁরা সেই শিশু-দেহটি ধুয়ে মুছে বিধিমতো তার পূজা করলেন। তারপর তাঁরা উত্তর দিকে গেলেন। সেখানে তাঁরা একবারে প্রথমেই একটি দাঁতাল হাতি পেলেন। তাঁরা সেই হাতির মাথা এনে তার শরীরে জুড়ে দিলেন। হাতির মাথা জুড়ে দিয়ে সব দেবতা ভগবান শিব সহ সকলকে প্রণাম করে বললেন যে, আমরা আমাদের কাজ সম্পূর্ণ করেছি। এবার যা বাকি আছে, তা আপনারা সম্পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মা বললেন- তখন শিবের আদেশ পালনকারী দেবতাদের কথা শুনে সকল দেবতা এবং পার্ষদগণ মহা আনন্দিত হলেন। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সব দেবতা
তাঁদের প্রভু নির্গুণস্বরূপ ভগবান শংকরকে প্রণাম করে বললেন-'স্বামিন্! আপনার ন্যায় মহাত্মার যে তেজ থেকে আমরা সকলে উৎপন্ন হয়েছি, আপনার সেই তেজ বেদমন্ত্রসহ এই বালকে প্রবেশ করুক।' এইভাবে সব দেবতারা একত্র হয়ে বেদমন্ত্র দ্বারা জলকে অভিমন্ত্রিত করে শিবকে স্মরণ করে সেই উত্তম জল বালকের শরীরে ছেটালেন। সেই জলের স্পর্শ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বালক শিবেচ্ছায় শীঘ্রই চেতনা পেয়ে জীবিত হয়ে গেল এবং নিদ্রিত মানুষের মতো উঠে বসল। সেই সৌভাগ্যশালী বালক অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর মুখ হাতির মতো ছিল। দেহের রং

সবজে-লাল এবং দেহে প্রসন্নতা ফুটে উঠেছিল। অত্যন্ত কমনীয় তার আকৃতি এবং তা সুন্দর প্রভা বিস্তার করেছিল। মুনীশ্বর! পার্বতী-নন্দন সেই বালককে জীবিত দেখে সেখানে উপস্থিত সকলে আনন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন এবং তাঁদের সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে গেল। তখন আনন্দে বিভোর হয়ে সকলে সেই বালককে পার্বতীকে দেখালেন। নিজ পুত্রকে জীবিত দেখে পার্বতী পরম প্রসন্ন হলেন।
[রুদ্র সংহিতা, চতুর্থ (কুমার) খণ্ড, অধ্যায় ১৩-১৮]
পরবর্তীতে স্বয়ং মহাদেব বর্ণিত করেন যে গণেশ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে আবির্ভাব হন বিধায় গণেশ চতুর্থী ব্রত পালন করা উচিত। গণেশকে সব দেবতার অগ্রে পূজা করার বিষয়েও বরদান দেওয়া হয়।

গণেশ একদিকে সিদ্ধিদাতা আর অন্যদিকে বুদ্ধিদাতা। ভারতের বহুল পরিচিত পঞ্চমতের একজন আরাধ্য হচ্ছেন গণেশ। অদ্বৈত দর্শন ও স্মার্ত সিদ্ধান্তে গণেশকে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা ও সূর্যের সমান তথা পরমেশ্বর জ্ঞান করা হয়।

ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ🙏
জয় গণপতি বাপ্পা, মোরিয়া🙏

তথ্যসূত্র -
সংক্ষিপ্ত শিবপুরাণ - গীতাপ্রেস



মা যশোদা কর্তৃক রজ্জু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন

নিরঞ্জন দাশ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন-একদিন গৃহের সমস্ত পরিচারিকারা যখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন মা যশোদা স্বয়ং দধি মন্থন করতে শুরু করেছিলেন। দধি মন্থন করার সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণপূর্বক তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করে গান করছিলেন।যশোদাদেবী কেশর-পীত বর্ণের শাড়ি পরিধান করে, তাঁর বিশাল নিতম্বদেশে কোমরবন্ধ বেঁধে দধিমন্থন দণ্ডের রজ্জু আকর্ষণ করছিলেন। তখন তাঁর হাতের কঙ্কণ ও কানের কুণ্ডল দোদুল্যমান ও শব্দায়মান হয়েছিল এবং তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। পুত্রস্নেহে তাঁর স্তনযুগল দুধের দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। তাঁর সুন্দর ভ্রূযুগল সমন্বিত মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়েছিল এবং তাঁর কবরী থেকে মালতী ফুল ঝরে পড়ছিল।মা যশোদা যখন দধিমন্থন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করার অভিলাষী হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর আনন্দ উৎপাদন করার জন্য মন্থনদণ্ড ধারণ করে তাঁর দধিমন্থন কার্যে বাধা দিয়েছিলেন।
মা যশোদা তখন কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করতে দিয়ে স্মিত হেসে তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করছিলেন। গভীর স্নেহে আপনা থেকেই তাঁর স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি যখন দেখেছিলেন যে, চুলার উপরে রাখা দুধের পাত্র থেকে দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি দুগ্ধপানে অতৃপ্ত তাঁর পুত্রকে পরিত্যাগ করে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলেন।
মা যশোদা চুলা থেকে গরম দুধ নামিয়ে রেখে, দধিমন্থন স্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, দধিভাণ্ড ভগ্ন হয়েছে এবং সেখানে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি কৃষ্ণেরই কার্য।



কৃষ্ণ তখন উল্টাভাবে রাখা একটি উদ্‌খলের উপর বসে তাঁর ইচ্ছামতো দই, ননী আদি দুগ্ধজাত দ্রব্য বানরদের বিতরণ করছিলেন। চুরি করার ফলে তাঁর মা তাঁকে তিরস্কার করতে পারেন বলে মনে করে, শঙ্কিতভাবে 'ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিলেন। মা যশোদা তখন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ধীরে ধীরে তাঁর পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মাকে ছড়ি হাতে সেখানে উপস্থিত দেখলেন, তখন তিনি দ্রুতবেগে উদ্‌খলের উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে পলায়ন করেছিলেন, যেন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছেন। যাঁকে যোগীরা কঠোর তপস্যার বলে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করার দ্বারা ব্রহ্মে লীন হওয়ার চেষ্টা করেও তাঁকে প্রাপ্ত হয় না, মা যশোদা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে তাঁকে ধরার জন্য তাঁর পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অনুধাবনকারিণী সুমধ্যমা যশোদাদেবীর গতি তাঁর নিতম্বভারে মন্থর হয়েছিল। দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের পিছনে ধাবিত হওয়ার ফলে তাঁর কবরী শিথিল হওয়ার তা থেকে ফুলগুলি স্খলিত হয়ে তাঁর অনুগমন করছিল। অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ফেলেছিলেন।

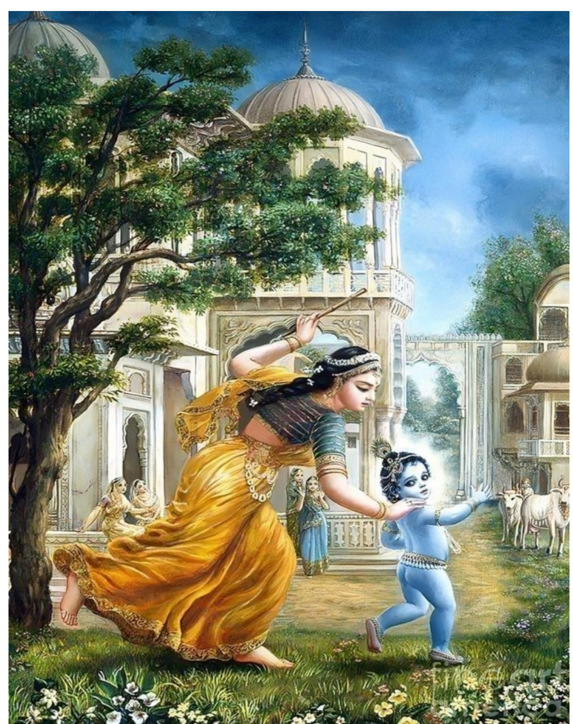
মা যশোদা তাঁকে ধরে ফেললে, কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। মা যশোদা তখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ ক্রন্দন করতে করতে তাঁর হাত দিয়ে নয়নযুগল ঘর্ষণ করার ফলে, তাঁর সারা মুখে কাজল লেগে গেছে। মা যশোদা তখন তাঁর সুন্দর পুত্রটিকে হাত দিয়ে ধরে মৃদু ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

মা যশোদা সর্বদাই কৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহে বিহ্বল থাকতেন, এবং তাই তিনি জানতেন না শ্রীকৃষ্ণ কে এবং তাঁর প্রভাব কি রকম?

কৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহবশত তিনি কখনও জানার চেষ্টাও করেননি যে, তিনি কে ছিলেন?

তাই তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্রটি অত্যন্ত ভীত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি ফেলে দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি আর কোন দুষ্টুমি করতে না পারেন।

ভগবানের আদি-অন্ত নেই, বাহ্য-অন্তর নেই, পূর্ব-পশ্চাৎ নেই। অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি কালের নিয়ন্ত্রাধীন নন, তাই তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে নিত্য বর্তমান। দ্বৈতভাবের অতীত পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে, যদিও তিনি সব কিছুরই কার্য এবং কারণ, তবুও তিনি কার্য এবং কারণের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত। সেই অব্যক্ত পুরুষ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত, তিনি এখন একটি নরশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে দড়ি দিয়ে একটি উদ্‌খলে বেঁধে রেখেছেন।



মা যশোদা যখন অপরাধী বালকটিকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, বন্ধন রজুটি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ছোট। তাই তিনি তখন সেই রজুটির সঙ্গে আর একটি রজ্জু যুক্ত করেছিলেন। সেই নতুন রজ্জুটিও দুই আঙ্গুল ছোট হয়েছিল। তখন তার সঙ্গে আর একটি রজ্জু যোগ করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা দুই আঙ্গুল ছোট হয়েছিল। এইভাবে মা যশোদা যত রজ্জু জুড়েছিলেন, সেই সবই দুই আঙ্গুল ছোট হতে লাগল।

এইভাবে মা যশোদা তাঁর গৃহের সমস্ত রজ্জু একের পর এক যুক্ত

করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না। মা যশোদার সখী প্রতিবেশিনী গোপীরা সেই মজার ব্যাপারটি দর্শন করে হাসছিলেন। মা যশোদাও পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হাসছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে বিস্মিতা হয়েছিলেন।
মা যশোদা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছিলেন, এবং তাঁর করবিস্থিত মালা স্খলিত হয়েছিল। বালকৃষ্ণ তাঁর মাকে এইভাবে পরিশ্রান্তা দেখে, তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে বন্ধনগ্রস্ত হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্রঃশ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ দশম স্কন্দ ৯ম অধ্যায়।

দামোদর লীলার তাৎপর্য:
* ভক্তি ও শরণাগতি: এই লীলায় কৃষ্ণ ভক্তের রূপে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি মা যশোদার কাছে শরণাগত হয়েছেন এবং তাঁর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।
* ভগবানের লীলা: কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান হলেও তিনি মানুষের মতো আচরণ করে তাঁর ভক্তদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন।
* মা-শিশুর প্রেম: এই লীলা মা-শিশুর মধ্যে অসীম প্রেমের একটি সুন্দর উদাহরণ।
* শৈশবের সরলতা: কৃষ্ণের শৈশবের এই খেলাধুলা ভক্তদের মনে শৈশবের সরলতা ফিরিয়ে আনে।
*ভক্তের অধীনে ভগবান: যদি ভগবানের প্রতি গভীর ভক্তি, নিষ্ঠা, একনিষ্ঠতা, শুদ্ধ প্রেম থাকে তাহলে ভগবান সেই ভক্তের অধীনে চলে যান।
রাবণেরও ভগবান শিবের প্রতি এই ভক্তি ছিল যার ফলে ভগবান শিব রাবণের গৃহেও আবদ্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শর্তসাপেক্ষে।

শিশুতোষ - কলাম



কানাইয়ের দুষ্টুমি

নিরঞ্জন দাশ

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের তিথি অষ্টমী,
কংসের কারাগারে এসেছে কানাই,উদ্ধার হেতু ধরনী।

যমুনা পাড়ি দিয়ে বাল্যলীলা করিতে গেলেন গোকুলে,
যত দুষ্টুমি আর খেলা সবই করিলো মা যশোদার কোলে।



দুষ্টের শিরোমণি, শান্তির রাজা ঐ নন্দন কানন,
করলো সে বাল্যকালেই পুতনা রাক্ষসী দমন।

যমুনাতে বাস ছিল অহংকারী বিষধর কালীয় নাগ,
তারই ফণাতে নৃত্য করছেন আর করেছেন কালীয়ের অহংকার নাশ।

পিতা মাতা সাথে মথুরাবাসীকে উদ্ধার হেতু গেলেন মথুরাতে,
মল্ল যুদ্ধে পরাজিত করেন বলরাম ও কৃষ্ণ মিলে অত্যাচারী কংসকে।



তারপর একে একে সকল দুষ্টকে দিয়েছেন শাস্তি,
পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন ফিরিয়ে শান্তি।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতন করেছেন ধ্বংসযজ্ঞের লীলা,
জরা নামক ব্যাধের তীরে বাম পদস্থে রক্তপাত করে করেন দ্বাপরের লীলা।

সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি,
সর্বদাই অধর্মীদের নাশ আর থাকবেন আনুগত্য সাধুদের প্রতি।



যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

হে ভারত ! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়,
তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।

সংস্কৃত সহজপাঠ – দৈনিক প্রয়োগে উপযোগী শব্দ ও বাক্য

সংস্কৃত শব্দ	সংস্কৃত বাক্য
• अस्मि (অস্মি) - (আমি) আছি असि (অসি) - (তুমি/আপনি) আছো/আছেন अस्ति (অস্তি) - (সে/এটি) আছে	• भवान्/भवती कथमसि (कथम् + असि)? ভবান্/ভবতী কথমসি (কথম্ + অসি)? আপনি কেমন আছেন? (কথম্ + অসি - কথমসি)
• कुशलः (পুং, কুশলঃ) - ভালো कुशला (স্ত্রী, কুশলা) - ভালো कुशलम् (ক্লী. কুশলম্) - ভালো	• अहं कुशलोऽस्मि/कुशलाऽस्मि অহম্ কুশলোঽস্মি (পুং)/কুশলাঽস্মি(স্ত্রী) আমি ভালো আছি (◌ঃ + অ - ঽ ও পূর্বে বিসর্গ উঠে ও-কার, ◌া + অ - ঽ)
• भवान् (পুং, ভবান্) - আপনি भवती (স্ত্রী, ভবতী) - আপনি	
• कथम् (কথম্) - কেমন नूतनम् (নূতনম্) - নতুন पुस्तकम् (পুস্তকম্) - পুস্তক	• पुस्तकम् नूतनम् अस्ति পুস্তকম্ নূতনম্ অস্তি বইটি নতুন আছে/বইটি নতুন



"প্রশ্নোত্তর পর্ব: আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর"

প্রশ্ন - ১: মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার পর মূর্তি চৈতন্য হয়ে যায় কি? এবং বিসর্জন করার পর মূর্তির মৃত্যু হয় কি? যদি উত্তরে বলেন হ্যাঁ, তো কোন মৃত মৌমাছিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে জীবিত করতে পারবেন কি?

উত্তর: প্রাণ প্রতিষ্ঠা মানে কারোর জীবন দান নয়। ধর্মকে (ধর্ম বলতে একমাত্র ধর্ম তথা সনাতন, সত্য ধর্মকে বুঝাচ্ছি) বিশ্বাস তথা অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা জানা যায় না। ইতিহাসের সব প্রমাণ পাওয়া যায় না বিধায় ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারাও ধর্মের সম্পূর্ণ বিচার হয় না। ব্রহ্মসূত্র ৪/১/৫ এ রয়েছে - প্রতীককে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করা গেলেও ব্রহ্মকে প্রতীক রূপে উপাসনা করা যায় না কারণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বোৎকৃষ্ট। সংস্কৃত-ইংরেজি আপ্টে অভিধানে 'প্রতিষ্ঠাপনং' শব্দের অর্থ করা হয়েছে - Consecrating or setting up of an idol; যার অর্থ প্রতিমা শুদ্ধিকরণ বা স্থাপন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা, পুষ্প অঞ্জলী বা দান ধ্যানের মতো পূজার একটি অঙ্গ মাত্র। কোথাও বলা হয় নি প্রাণ প্রতিষ্ঠা মানে জীবন দান।

প্রশ্ন - ২: লক্ষ্মী পূজা করে যদি ধনী হওয়া যায়, তাহলে বিল গেটস, এলন মাস্ক, জেফ বেজোস, আজিম প্রেমজি - এসব ধনীরা তো হিন্দু ধর্মের নন, তবুও তারা ধনী কেন? কেন ভারত, নেপাল এখনো হিন্দু প্রধান দেশ হয়েও দরিদ্র? সেসব দেশগুলোর হিন্দুরা তো সাকাররূপে লক্ষ্মীর পূজা ও নিরাকার রূপে লক্ষ্মীর ধ্যান ও জপ করেও ধনী হয়না কেন?

উত্তর: লক্ষ্মী পূজা করলেই কেউ ধনী হয়ে যাবে এমন কোথাও বলা হয় নি, কর্মও করতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম ত্যাগ রূপ সন্ন্যাসের থেকেও কর্ম সন্ন্যাস উত্তম বলা হয়েছে (৫/৬)। পূজা করা হয় কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে। পূজা যেমন কর্মকাণ্ড তেমনি ধনী হওয়ার জন্য কর্ম করাও কর্মকাণ্ডেরই অংশ। কর্ম করে যেতে

হবে সাথে সন্ন্যাসও পালন করতে হবে। কর্ম করতে হবে, কর্মফল ভোগ করতে হবে কিন্তু কর্মফলের প্রতি আসক্ত হওয়া যাবে না - এটাই ভগবানের নির্দেশ।

প্রশ্ন - ৩: শাস্ত্রে কোথাও শিব ও বিষ্ণুর ভিন্নতা আবার কোথাও বা অভিন্ন মনে করার বিষয়ে বলা হচ্ছে। এমনকি ওইরকম মনে না করলে (ভিন্ন যেখানে সেখানে ভিন্ন ও অভিন্ন সেখানে অভিন্ন মনে না করলে) বিভিন্ন পাপের কথাও বলা হচ্ছে। - এই বিষয়ের সমাধান কি?

উত্তর: অদ্বৈত অনুযায়ী উপাসনা ও ধর্মীয় কার্য দুই ধরনের। একটি ব্যবহারিক ও অন্যটি তাত্ত্বিক। ব্যবহারিক উপাসনা মূলত দ্বৈতাদি ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত পরম্পরানুগ মত দর্শন অনুযায়ী হয়ে থাকে। ব্যবহারিক উপাসনা ক্ষেত্রেই শুধু ভেদ লক্ষিত হয়, এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোনো একটি রূপের আরাধনা করার সময় সেই রূপকেই শ্রেষ্ঠ বিচার পূর্বক আরাধনা করতে হয়। কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে সবাই এক, আর সেই চিন্তায় উপাসনা মূলত অদ্বৈত!

এইসব ক্ষেত্রে মূলত 'ন হি নিন্দা ন্যায়' দ্বারা বিচার করতে হয় অর্থাৎ, শুধুমাত্র প্রশংসা গ্রহণযোগ্য। অদ্বৈত মত দর্শন অনুযায়ী ভারতবর্ষের পঞ্চমতের আরাধ্যগণ সম্পূর্ণ অভিন্ন কিন্তু ব্যবহারিক পূজায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও চিন্তা ধারায় পূজা করতে হয়।

প্রশ্ন - ৪: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১০/২১ শ্লোকে ঈশ্বর বলেছেন, " নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র" - এটা কি করে যৌক্তিক হতে পারে? চন্দ্র তো পৃথিবীর উপগ্রহ তাহলে নক্ষত্র কি করে হয়?

উত্তর: নক্ষত্র বলতে উক্ত স্থানে আধুনিক বিজ্ঞানের নক্ষত্র বুঝাচ্ছে না। বেদাঙ্গের অন্যতম নিরুক্ত ৩/২০/১১ অনুযায়ী মহাকাশের ঘূর্ণায়মান বা গতিশীল কোনোকিছুকেই নক্ষত্র বলা যায়। কাল, তিথি ইত্যাদি যে জ্যোতিষ দ্বারা বিচার করা হয় সেটা গাণিতিক জ্যোতিষ। সেই জ্যোতিষ অনুযায়ী ২৭ টি নক্ষত্র রয়েছে (মতান্তরে ২৮ টি)। মূলত এগুলো চন্দ্রের গতিপথ। সূর্যের গতিপথকে ১২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে আর সেই ১২ টিকে রাশি বলে। অর্থাৎ নক্ষত্র হচ্ছে চন্দ্রের অবস্থান বা নিবাসস্থান, সেগুলোকে ২৭ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গতিপথগুলোর মূল অধিপতি মূলত চন্দ্র (যেহেতু চন্দ্রের গতিপথ)। প্রায় ২৮ দিনে চন্দ্রমাস হয় (তিথির হিসেব দেখলেই বুঝা যাবে)। তাছাড়া বেদ সম্মত পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী চন্দ্রের ২৭ জন পত্নী এবং সেই ২৭ জন হচ্ছে প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। চন্দ্র একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজের পত্নীদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে অবস্থান করেন। ওই ২৭ জন পত্নীই ২৭ নক্ষত্রের প্রকাশক। উক্ত শ্লোকে চন্দ্রকে নক্ষত্রের অধিপতি বলা হয়েছে। অধিপতি অর্থ - যার অধীনে কেউ থাকে বা পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী চন্দ্র হচ্ছেন গৃহকর্তা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মূলত নিজেকে সর্বোচ্চ বুঝাতে এমন তুলনা করেছেন (পরবর্তী শ্লোকগুলোতেও এমন আরো কিছু তুলনা প্রদর্শিত হয়েছে)।

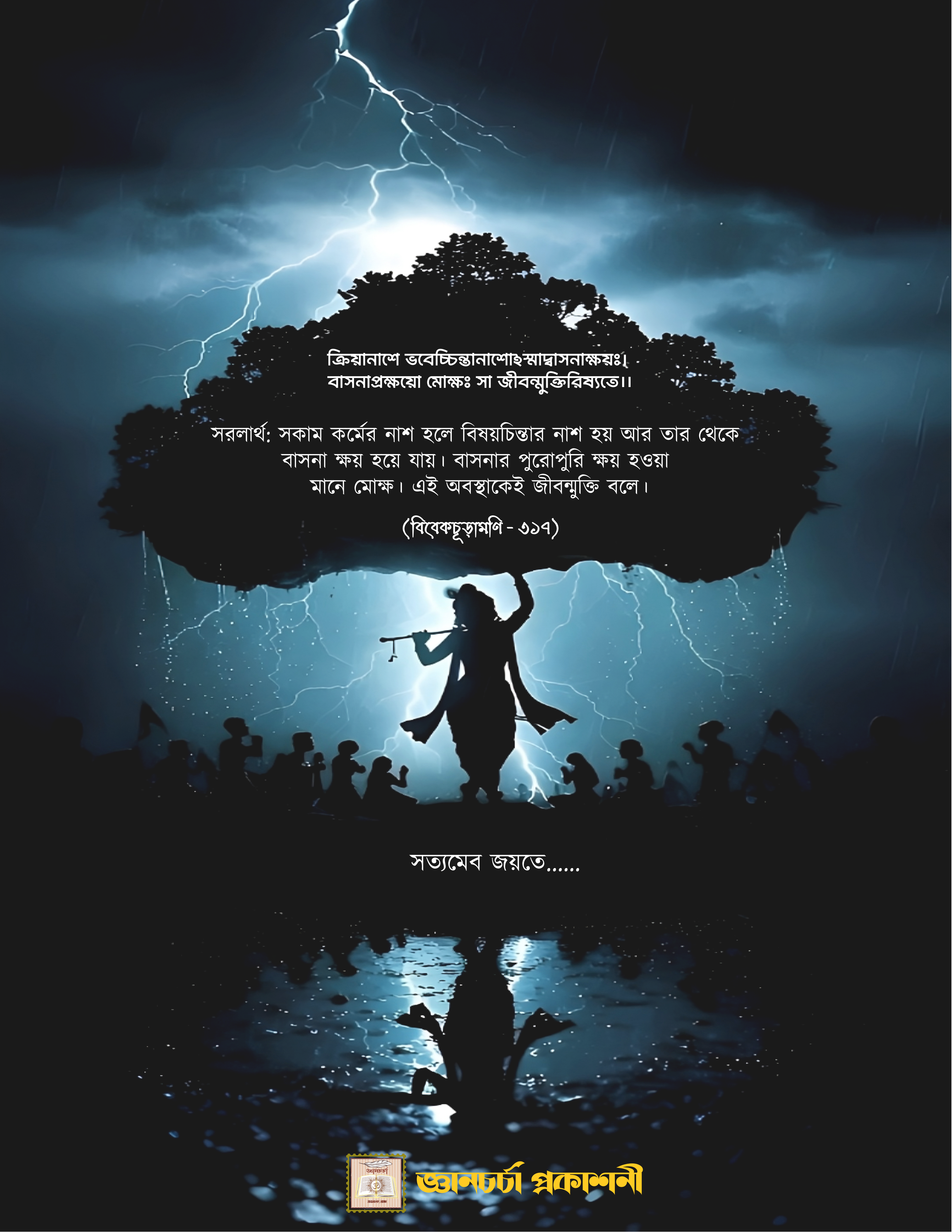
আপনার প্রশ্ন পাঠাতে অনুসরণ করুন অথবা **স্ক্যান করুন**

To: shashwata.satya@gmail.com

Subject: প্রশ্নোত্তর পর্ব

Compose email
প্রশ্ন - ....?
নাম - (বাংলায় আপনার নাম লিখবেন)
ঠিকানা - (উপজেলা, জেলা ও বিভাগের নাম লিখবেন)

Scan



ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে।।
সরলার্থ: সকাম কর্মের নাশ হলে বিষয়চিন্তার নাশ হয় আর তার থেকে
বাসনা ক্ষয় হয়ে যায়। বাসনার পুরোপুরি ক্ষয় হওয়া
মানে মোক্ষ। এই অবস্থাকেই জীবন্মুক্তি বলে।
(বিবেকচূড়ামণি - ৩১৭)
সত্যমেব জয়তে......
জ্ঞানচর্চা প্রকাশনী